ক্ষুদ্র ও বৃহৎ

'আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী' 'রত্নপরীক্ষা,' 'বাঙ্গালা
ব্যাকরণ' ও 'বাঙ্গালা শব্দকোষ' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা,
উপাধ্যায়, রায় বাহাদুর,

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, এম, এ; বিদ্যানিধি,
বিজ্ঞানভূষণ

প্রথম সংস্করণ

SEN BROTHERS & CO.,
PUBLISHERS AND BOOKSELLERS
8 & 9 College Street, Calcutta.

1920

[মূল্য বার আনা মাত্র।]

সূচীপত্র

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ

পূর্ব্বকালে হাত পা দিয়া অন্তর বা দৈর্ঘ্য মাপা হইত। হাত পা আঙ্গুল, আমাদের স্বাভাবিক মানযন্ত্র। এখনও আমরা হাত পা আঙ্গুল দিয়া অন্তর মাপিয়া থাকি।

দুইটি স্থানের অন্তর বুঝাইতে হইলে, দুই দণ্ডের পথ, পাঁচ দিনের রাস্তা, দশ দিনে যাওয়া যায়, ইত্যাদি বলিয়া থাকি। এক দিনে হাঁটিয়া দশ ক্রোশ পথ যাওয়া যায়। সুতরাং এক দিনের পথ বলাও যা, দশ ক্রোশ বলাও তা। কালক্রমে এখন ইঞ্চি গজ মাইল এ দেশে প্রচলিত হইতেছে।

কিন্তু এখন আর দুই দশ দিনের পথ, বা এক শত দুই শত মাইল দূর, তত বেশী বোধ হয় না। এখন রেল-গাড়ীর দ্বারা পূর্ব্বকালের দূরবর্ত্তী স্থান নিকটস্থ হইয়াছে। এখন দূরবর্ত্তী দুইটি স্থানের অন্তর বুঝাইতে হইলে আমরা রেলে এত ঘণ্টার বা এতদিনের পথ বলিয়া থাকি।

বহু পূর্ব্বকালে লোকে পৃথিবীটা মাপিয়া ফেলিয়াছিল। যে কৌশলে আর্য্যগণ পৃথিবীর ব্যাস ১৬০০ যোজন ঠাওরাইয়াছিলেন, সেই কৌশল সূক্ষ্মরূপে লাগাইয়া আজ কাল আমরা পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল বলিয়া জানিতেছি।

তবেই, পৃথিবীর মধ্যস্থল দিয়া একটা সুড়ঙ্গ করিতে পারিলে তাহা ৮০০০ মাইল দীর্ঘ হইবে। ঐ সুড়ঙ্গের দুই প্রান্তে দুই জন লোক দাঁড়াইলে তাঁহারা পরস্পর ৮০০০ মাইল দূরে থাকিবেন। পূর্ব্বকালে কেহ কেহ এইরূপ সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া না-কি পাতালে যাইতেন।

কিন্তু কলিকালে এরূপ সুড়ঙ্গের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং পৃথিবীর উপর দিয়াই ঘুরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু উপর দিয়া পাতালে যাইতে ১২,৫০০ মাইল পথ মাত্র যাইতে হইবে। আমরা যেখানেই থাকি, পরস্পর ইহা অপেক্ষা বেশী দূরে থাকিতে পারি না।

কিন্তু এটা আর তত দূর কি? আমাদের দেশেও রেলগাড়ী ঘণ্টায় ৩০ মাইল পথ যায়। রেল পাতিয়া গাড়ীতে চড়িয়া গেলে ১৭।১৮ দিনেই পাতালে যাইতে পারা যায়। রেলের ডাক-গাড়ী ঘণ্টায় ৬০।৭০ মাইল বেগে যাইয়া থাঁকে। সুতরাং রেলের ডাক-গাড়ীতে ৮।৯ দিনেই পাতালে পঁহুছিতে পারি। পাতাল কত দূর বোধ হইতেছিল! পৃথিবীটা পূর্ব্বে কত বড় দেখাইতেছিল!

তবে, পৃথিবীতে অধিক দূরে যাইবার দেশ নাই। পৃথিবীর পরেই চন্দ্রলোক। আজকাল সেকালের তপঃপ্রভাব নাই, নতুবা চন্দ্রলোকটা কত দূরে একবার দেখিয়া আসা যাইত। কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদেরা এখানে থাকিয়াই এখান হইতে চন্দ্র কত দূরে, তাহা মাপিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এখান হইতে চন্দ্র প্রায় ২,৪০,০০০ মাইল দূরে।

এখানে একটা কথা উঠিতেছে। পৃথিবীতে থাকিয়া তাঁহারা কিরূপে চন্দ্রের দূরত্ব মাপিলেন? যে উপায়ে এ পারে থাকিয়া নদীর বিস্তার মাপিতে পারা যায়, হিমালয়ে না উঠিয়াও উহার তুঙ্গশৃঙ্গের উচ্চতা মাপিতে পারা যায়, সে উপায়েই চন্দ্রের অন্তর মাপা গিয়াছে। ইহা আজকার কথা নহে, বহু পূর্ব্বকালেও লোকে এই প্রকারে চন্দ্রের অন্তর মাপিয়াছিলেন। উপায়টা কি?

যখন নৌকাযোগে নদী দিয়া যাই, কূলের গাছগুলা বিপরীত দিকে সরিয়া যাইতে দেখি। ঐ যে বটগাছ, এখন আমাদের ঠিক দক্ষিণে দেখিতেছি, নৌকা কিছুদূর সোজা বাহিয়া গেলে আমাদের পশ্চাদ্দিকে

দেখিব। অবশ্য গাছটা সরিয়া যায় না ; দুই স্থান হইতে দেখিলে গাছটা কোণে সরিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু বটগাছের সোজা বহুদূরে যে অশ্বত্থ গাছ ছিল, সেটা বটগাছের মতন বেশী সরিয়া যাইতে দেখি না। যত অংশ বা কলা সরিতে দেখি, তাহা, এবং অতিক্রান্ত পথ বলিয়া দিলে গণিতজ্ঞ গাছটার দূরত্ব বলিয়া দিতে পারেন।

চন্দ্র হইতে কেহ পৃথিবী দেখিলে, আকাশে আমাদের নিকট চাঁদ যেমন দেখায়, তাঁহার নিকট পৃথিবী তেমনই বোধ হইবে। কিন্তু আমরা চাঁদকে যত বড় দেখি, চন্দ্রবাসী পৃথিবীকে তদপেক্ষা ৩।৪ গুণ বড় দেখিবেন। ৮০০০ মাইল ব্যাসের পৃথিবী যখন চন্দ্র হইতে এত ছোট দেখাইতেছে, তখন চন্দ্র অনেক দূরে আছে, বলিতে হইবে। কিন্তু দূরে থাকিলেও ৩০টা পৃথিবী পাশে পাশে বসাইয়া চাঁদ পর্য্যন্ত পথ করিতে পারা যায়। দ্রুতগামী রেলের গাড়ীতে গেলে ৮।৯ মাসেই চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইতে পারা যায়। তবে, চন্দ্র আর দূরে কি!

চন্দ্রের পরেই সূর্য্যের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ আছে। সূর্য্য কত দূরে? ইহাও জ্যোতির্ব্বিদেরা নির্ণয় করিতে ছাড়েন নাই। কিন্তু তাঁহারা বলেন যে, সূর্য্যের সহিত আমাদের নিকট সম্বন্ধ থাকিলেও, আমাদের মধ্যে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল ব্যবধান। এই অন্তর বলা যত সহজ, মনে ধারণা করা তত সহজ নহে।

সূর্য্য-মণ্ডল এখান হইতে কত দিনের পথ হইবে? একদিনের পথ দশ ক্রোশ, এই হিসাবে এখান হইতে সূর্য্য ১২,৭০০ বৎসরের পথ। লোকে বলে বেদও ৫।৬ হাজার বৎসরের অধিক পুরাতন নয়। তবেই, বৈদিক ঋষিগণ সূর্য্যাভিমুখে যাইতে আরম্ভ করিয়া থাকিলে অদ্যাবধি অর্দ্ধেক পথও যাইতে পারেন নাই। অতএব হাঁটিয়া যাওয়া বৃথা। বোধ হয় রেলের গাড়ীতে

গেলে তাঁহারা জীবদ্দশাতেই সূর্য্যমণ্ডলে উপস্থিত হইতে পারিতেন। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য, ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে গেলেও তাঁহাদিগের ৩৫০ বৎসর লাগিত! শব্দ না-কি খুব দ্রুত যায়? প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১১০০ ফুট বেগে ধাবিত হয়। কিন্তু শব্দে চড়িয়া গেলেও সূর্য্যে পঁহুছিতে ১৪।১৫ বৎসর লাগিয়া যাইবে! অর্থাৎ এখনই যদি সূর্য্যে একটা ভীষণ শব্দ উৎপন্ন হয়, আমরা ১৫ বৎসর পরে সেই শব্দ টের পাইব! তবে, শব্দও বড় মৃদু গমন করে। আলোক অপেক্ষা দ্রুতগামী আর কিছুই নাই। প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করে। কিন্তু আলোকে চড়িয়া গেলেও সূর্য্যে পঁহুছিতে প্রায় ৫০০ সেকেণ্ড বা ৮ মিনিট সময় লাগিবে। মনে রাখিবেন, এক সেকেণ্ডে আলোক আমাদের পৃথিবী সাত আট বার ঘুরিয়া আসিতে পারে। এখনই যদি সূর্য্য নিবিয়া যায়, আট মিনিট পরে আমরা অন্ধকার দেখিব!

কি বিষম দূরে বিধাতা সূর্য্যকে বসাইয়াছেন!

সূর্য্য অত দূরে, তবুও সূর্য্যবিম্ব প্রায় ৩২ কলা বড় দেখায়। সূর্য্য-দেহ তবে কত বড়? উহা এত বড় যে, চন্দ্র-সহিত পৃথিবী সূর্য্যের উদরে প্রবেশ করিলে চন্দ্রের বাহিরে প্রায় ৬,০০,০০০ মাইল সূর্য্যের উদর শূন্য থাকিবে। বিধাতা সূর্য্যকে কি বিশাল দেহ দিয়াছেন!

১০৯টা পৃথিবী সূর্য্যের উদর মধ্যে থাকিতে পারে। কিন্তু তা বলিয়া ১০৯টা পৃথিবী ভাঙ্গিয়া একটা সূর্য্য গড়িতে পারা যাইবে না। বাস্তবিক সূর্য্যের মতন একটা গোলা নির্ম্মাণ করিতে হইলে তের লক্ষ পৃথিবী ভাঙ্গিতে হইবে। ইহার তুলনায় চাঁদ কত ছোট! পৃথিবীর ৫০ ভাগের এক ভাগ পাইলেই একটা চাঁদ গড়িতে পারা যায়। অথচ আকাশে চাঁদ যত বড় দেখায়, সূর্য্যও প্রায় তত বড় দেখায়। সূর্য্যের দেহ নিতান্ত প্রকাণ্ড, নচেৎ অত দূরে থাকিয়াও সূর্য্য চাঁদের মতন বড় দেখাইবে কেন?

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ

পূর্ব্বকালে হাত পা দিয়া অন্তর বা দৈর্ঘ্য মাপা হইত। হাত পা আঙ্গুল, আমাদের স্বাভাবিক মানযন্ত্র। এখনও আমরা হাত পা আঙ্গুল দিয়া অন্তর মাপিয়া থাকি।

দুইটি স্থানের অন্তর বুঝাইতে হইলে, দুই দণ্ডের পথ, পাঁচ দিনের রাস্তা, দশ দিনে যাওয়া যায়, ইত্যাদি বলিয়া থাকি। এক দিনে হাঁটিয়া দশ ক্রোশ পথ যাওয়া যায়। সুতরাং এক দিনের পথ বলাও যা, দশ ক্রোশ বলাও তা। কালক্রমে এখন ইঞ্চি গজ মাইল এ দেশে প্রচলিত হইতেছে।

কিন্তু এখন আর দুই দশ দিনের পথ, বা এক শত দুই শত মাইল দূর, তত বেশী বোধ হয় না। এখন রেল-গাড়ীর দ্বারা পূর্ব্বকালের দূরবর্ত্তী স্থান নিকটস্থ হইয়াছে। এখন দূরবর্ত্তী দুইটি স্থানের অন্তর বুঝাইতে হইলে আমরা রেলে এত ঘণ্টার বা এতদিনের পথ বলিয়া থাকি।

বহু পূর্ব্বকালে লোকে পৃথিবীটা মাপিয়া ফেলিয়াছিল। যে কৌশলে আর্য্যগণ পৃথিবীর ব্যাস ১৬০০ যোজন ঠাওরাইয়াছিলেন, সেই কৌশল সূক্ষ্মরূপে লাগাইয়া আজ কাল আমরা পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল বলিয়া জানিতেছি।

তবেই, পৃথিবীর মধ্যস্থল দিয়া একটা সুড়ঙ্গ করিতে পারিলে তাহা ৮০০০ মাইল দীর্ঘ হইবে। ঐ সুড়ঙ্গের দুই প্রান্তে দুই জন লোক দাঁড়াইলে তাঁহারা পরস্পর ৮০০০ মাইল দূরে থাকিবেন। পূর্ব্বকালে কেহ কেহ এইরূপ সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া না-কি পাতালে যাইতেন।

কিন্তু কলিকালে এরূপ সুড়ঙ্গের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং পৃথিবীর উপর দিয়াই ঘুরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু উপর দিয়া পাতালে যাইতে ১২,৫০০ মাইল পথ মাত্র যাইতে হইবে। আমরা যেখানেই থাকি, পরস্পর ইহা অপেক্ষা বেশী দূরে থাকিতে পারি না।

কিন্তু এটা আর তত দূর কি? আমাদের দেশেও রেলগাড়ী ঘণ্টায় ৩০ মাইল পথ যায়। রেল পাতিয়া গাড়ীতে চড়িয়া গেলে ১৭।১৮ দিনেই পাতালে যাইতে পারা যায়। রেলের ডাক-গাড়ী ঘণ্টায় ৬০।৭০ মাইল বেগে যাইয়া থাঁকে। সুতরাং রেলের ডাক-গাড়ীতে ৮।৯ দিনেই পাতালে পঁহুছিতে পারি। পাতাল কত দূর বোধ হইতেছিল! পৃথিবীটা পূর্ব্বে কত বড় দেখাইতেছিল!

তবে, পৃথিবীতে অধিক দূরে যাইবার দেশ নাই। পৃথিবীর পরেই চন্দ্রলোক। আজকাল সেকালের তপঃপ্রভাব নাই, নতুবা চন্দ্রলোকটা কত দূরে একবার দেখিয়া আসা যাইত। কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদেরা এখানে থাকিয়াই এখান হইতে চন্দ্র কত দূরে, তাহা মাপিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এখান হইতে চন্দ্র প্রায় ২,৪০,০০০ মাইল দূরে।

এখানে একটা কথা উঠিতেছে। পৃথিবীতে থাকিয়া তাঁহারা কিরূপে চন্দ্রের দূরত্ব মাপিলেন? যে উপায়ে এ পারে থাকিয়া নদীর বিস্তার মাপিতে পারা যায়, হিমালয়ে না উঠিয়াও উহার তুঙ্গশৃঙ্গের উচ্চতা মাপিতে পারা যায়, সে উপায়েই চন্দ্রের অন্তর মাপা গিয়াছে। ইহা আজকার কথা নহে, বহু পূর্ব্বকালেও লোকে এই প্রকারে চন্দ্রের অন্তর মাপিয়াছিলেন। উপায়টা কি?

যখন নৌকাযোগে নদী দিয়া যাই, কূলের গাছগুলা বিপরীত দিকে সরিয়া যাইতে দেখি। ঐ যে বটগাছ, এখন আমাদের ঠিক দক্ষিণে দেখিতেছি, নৌকা কিছুদূর সোজা বাহিয়া গেলে আমাদের পশ্চাদ্দিকে

দেখিব। অবশ্য গাছটা সরিয়া যায় না; দুই স্থান হইতে দেখিলে গাছটা কোণে সরিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু বটগাছের সোজা বহুদূরে যে অশ্বত্থ গাছ ছিল, সেটা বটগাছের মতন বেশী সরিয়া যাইতে দেখি না। যত অংশ বা কলা সরিতে দেখি, তাহা, এবং অতিক্রান্ত পথ বলিয়া দিলে গণিতজ্ঞ গাছটার দূরত্ব বলিয়া দিতে পারেন।

চন্দ্র হইতে কেহ পৃথিবী দেখিলে, আকাশে আমাদের নিকট চাঁদ যেমন দেখায়, তাঁহার নিকট পৃথিবী তেমনই বোধ হইবে। কিন্তু আমরা চাঁদকে যত বড় দেখি, চন্দ্রবাসী পৃথিবীকে তদপেক্ষা ৩।৪ গুণ বড় দেখিবেন। ৮০০০ মাইল ব্যাসের পৃথিবী যখন চন্দ্র হইতে এত ছোট দেখাইতেছে, তখন চন্দ্র অনেক দূরে আছে, বলিতে হইবে। কিন্তু দূরে থাকিলেও ৩০টা পৃথিবী পাশে পাশে বসাইয়া চাঁদ পর্য্যন্ত পথ করিতে পারা যায়। দ্রুতগামী রেলের গাড়ীতে গেলে ৮।৯ মাসেই চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইতে পারা যায়। তবে, চন্দ্র আর দূরে কি!

চন্দ্রের পরেই সূর্য্যের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ আছে। সূর্য্য কত দূরে? ইহাও জ্যোতির্ব্বিদেরা নির্ণয় করিতে ছাড়েন নাই। কিন্তু তাঁহারা বলেন যে, সূর্য্যের সহিত আমাদের নিকট সম্বন্ধ থাকিলেও, আমাদের মধ্যে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল ব্যবধান। এই অন্তর বলা যত সহজ, মনে ধারণা করা তত সহজ নহে।

সূর্য্য-মণ্ডল এখান হইতে কত দিনের পথ হইবে? একদিনের পথ দশ ক্রোশ, এই হিসাবে এখান হইতে সূর্য্য ১২,৭০০ বৎসরের পথ। লোকে বলে বেদও ৫।৬ হাজার বৎসরের অধিক পুরাতন নয়। তবেই, বৈদিক ঋষিগণ সূর্য্যাভিমুখে যাইতে আরম্ভ করিয়া থাকিলে অদ্যাবধি অর্দ্ধেক পথও যাইতে পারেন নাই। অতএব হাঁটিয়া যাওয়া বৃথা। বোধ হয় রেলের গাড়ীতে

গেলে তাঁহারা জীবদ্দশাতেই সূর্য্যমণ্ডলে উপস্থিত হইতে পারিতেন। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য, ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে গেলেও তাঁহাদিগের ৩৫০ বৎসর লাগিত! শব্দ না-কি খুব দ্রুত যায়? প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১১০০ ফুট বেগে ধাবিত হয়। কিন্তু শব্দে চড়িয়া গেলেও সূর্য্যে পঁহুছিতে ১৪।১৫ বৎসর লাগিয়া যাইবে! অর্থাৎ এখনই যদি সূর্য্যে একটা ভীষণ শব্দ উৎপন্ন হয়, আমরা ১৫ বৎসর পরে সেই শব্দ টের পাইব! তবে, শব্দও বড় মৃদু গমন করে। আলোক অপেক্ষা দ্রুতগামী আর কিছুই নাই। প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করে। কিন্তু আলোকে চড়িয়া গেলেও সূর্য্যে পঁহুছিতে প্রায় ৫০০ সেকেণ্ড বা ৮ মিনিট সময় লাগিবে। মনে রাখিবেন, এক সেকেণ্ডে আলোক আমাদের পৃথিবী সাত আট বার ঘুরিয়া আসিতে পারে। এখনই যদি সূর্য্য নিবিয়া যায়, আট মিনিট পরে আমরা অন্ধকার দেখিব!

কি বিষম দূরে বিধাতা সূর্য্যকে বসাইয়াছেন!

সূর্য্য অত দূরে, তবুও সূর্য্যবিম্ব প্রায় ৩২ কলা বড় দেখায়। সূর্য্য-দেহ তবে কত বড়? উহা এত বড় যে, চন্দ্র-সহিত পৃথিবী সূর্য্যের উদরে প্রবেশ করিলে চন্দ্রের বাহিরে প্রায় ৬,০০,০০০ মাইল সূর্য্যের উদর শূন্য থাকিবে। বিধাতা সূর্য্যকে কি বিশাল দেহ দিয়াছেন!

১০৯টা পৃথিবী সূর্য্যের উদর মধ্যে থাকিতে পারে। কিন্তু তা বলিয়া ১০৯টা পৃথিবী ভাঙ্গিয়া একটা সূর্য্য গড়িতে পারা যাইবে না। বাস্তবিক সূর্য্যের মতন একটা গোলা নির্ম্মাণ করিতে হইলে তের লক্ষ পৃথিবী ভাঙ্গিতে হইবে। ইহার তুলনায় চাঁদ কত ছোট! পৃথিবীর ৫০ ভাগের এক ভাগ পাইলেই একটা চাঁদ গড়িতে পারা যায়। অথচ আকাশে চাঁদ যত বড় দেখায়, সূর্য্যও প্রায় তত বড় দেখায়। সূর্য্যের দেহ নিতান্ত প্রকাণ্ড, নচেৎ অত দূরে থাকিয়াও সূর্য্য চাঁদের মতন বড় দেখাইবে কেন?

আমাদের পৃথিবী কি ক্ষুদ্র! ক্ষুদ্র হইলেও কিন্তু উহা বৎসরে যে পথ ঘুরিয়া আসে, তাহা চিন্তা করুন। সূর্য্য হইতে পৃথিবী নয়কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তবে, আজ আমরা অন্তরীক্ষে যেখানে আছি, ছয় মাস পরে সেখান হইতে নয়কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইলের দ্বিগুণ, অর্থাৎ আঠার কোটি ষাটি লক্ষ মাইল দূরে যাইয়া পড়িব। পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে প্রতি ঘণ্টায় ৬৬,০০০ মাইল করিয়া আমরা ব্রহ্মাণ্ডের কত পথই বেড়াইতেছি! আশ্চর্য্য এই, এত দূরে যাইতেছি, কই কখনও ত কোন তারা কিংবা গ্রহের পাশ দিয়াও গেলাম না! বিধাতা তাঁহার রাজ্য দূরে দূরে স্থাপন করিয়াছেন।

অন্ধকার রাত্রে কত তারা দেখা যায়! মনে হয় বরং নদীর বালি গণিয়া দিতে পারি, তথাপি আকাশের তারা গণিতে পারি না। এত অসংখ্য তারায় আকাশ পরিপূর্ণ, তথাপি আঠার কোটি মাইল গেলেও তারাগুলা জ্যোতিঃকণা বই বড় দেখায় না। হয় ত তারাগুলা বহু বহু দূরে আছে, কিংবা তারাগুলার দেহ বাস্তবিক ক্ষুদ্র।

কিন্তু কি ভয়ানক! তারাগুলা হইতে দেখিলে পৃথিবীটা একবারে শূন্য হইয়া যায়! আট হাজার মাইল, অথচ ঐ বিষম দূরত্বের তুলনায় কিছুই হইল না! পৃথিবীর দুই মেরু হইতে দুইটা সূত্র কোনও তারা পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিলে, সূত্রদ্বয় পৃথক্ না দেখাইয়া একটা হইয়া যায়।

কিন্তু পৃথিবী যেন শূন্য, পৃথিবীর ভ্রমণ-পথটা ত বড়! পৌষমাসে আমরা আকাশের যেখানে থাকি, আষাঢ়মাসে সেখান হইতে আঠার কোটি মাইল দূরে যাইয়া পড়ি। মনে করুন যেন পৌষ মাসের পৃথিবী ও আষাঢ় মাসের পৃথিবী হইতে দুই গাছি সূত্র কোন তারার সহিত সংলগ্ন করা গেল। ঐ দুই সূত্রের মধ্যে কিছু না কিছু ফাঁক পড়িতে দেখা যাইবে। কেন-না আঠার কোটি মাইল ব্যবধানটা ত অল্প নহে।

কিন্তু কি ভয়ঙ্কর কথা! তারার দূরত্বের তুলনায় আঠার কোটি মাইল ব্যবধানও যে প্রায় শূন্য হইয়া গেল! দুই গাছি সূত্র যে এক দেখাইতে লাগিল! কোন তারাকে এখান হইতে দেখিলে যে রেখায়, আঠার কোটি মাইল দূর হইতে দেখিলেও যে সেই রেখায় দেখা যায়। এই বিষম অন্তর কল্পনা করিতে না পারিয়া প্রাচীনেরা সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণ অস্বীকার করিয়াছিলেন। এত দূরে তারা আছে যে, এখান হইতে দেখিলে যা আঠার কোটি মাইল দূর হইতে দেখিলেও তা!

জ্যোতির্ব্বিদেরা বিস্তর পরিশ্রম করিয়া নানা উপায়ে দুই চারিটা তারা পাইয়াছেন। তন্মধ্যে যে তারা সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে, সেখান হইতে দেখিলে পৃথিবী ও সূর্য্যের অন্তর এক বিকলাও দেখায় না। মনে করুন যেন উহা এক বিকলা পাওয়া গেল। এই এক বিকলার কি অর্থ শুনিবেন? ইহার অর্থ এই যে, চারি মাইল দূর হইতে একটা ডবল পয়সা মাপা। ইহার অর্থ এই যে, এখান হইতে সূর্য্য যত দূরে, তাহার দুই লক্ষ এগার হাজার গুণ দূরে সেই তারা অবস্থিত! পরিচিত মাইল হিসাবে শুনিতে চান? উহা কুড়ি লক্ষ কোটী মাইল দূরে! যদি অঙ্কে প্রবেশ করিতে চান, তবে দুইএর পরে তেরটা শূন্য বসাইয়া যান। মনে রাখিবেন, এক-এর পরে সাতটা শূন্য বসাইলে এক কোটি হয়।

পৃথিবী ও সূর্য্যের অন্তরটা মোটে নয়কোটি মাইল। সুতরাং ইহাকে তারার দূরত্ব মাপিবার মাপ-কাঠি করা বৃথা। এজন্য অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া জ্যোতির্ব্বিদেরা আলোকের একটা মাপ-কাঠি করিয়াছেন। কিন্তু আলোকের মাপ-কাঠি কি? প্রতি-সেকেণ্ডে আলোক এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল যায়, এমন দ্রুতগামী আলোক এক বৎসরে যত পথ যায়, তারাগুলার দূরত্ব মাপিবার মাপ-কাঠিটি তত বড়। এই অদ্ভুত মাপ-কাঠিটির নাম হইয়াছে আলোক-বর্ষ।

এই মাপ-কাঠি কত মাইল জানিতে চান? এত বড় যে, তাহার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাইতে হইলে দ্রুতগামী রেলের গাড়ীর এক কোটি বৎসরেরও অধিক সময় লাগিবে। এত বড় যে, পৃথিবী হইতে সূর্য্য যত দূরে, তত দূরে দূরে তেষট্টি হাজার সূর্য্য বসাইয়া গেলে সেই মাপ-কাঠির একটার সমান হইবে।

অনেক তারার দূরত্ব মাপিবার চেষ্টা হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন পরিমাণই ঠিক হইবার নহে। তথাপি যে তারাটি সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে বলিয়া মনে হয়, তাহার দূরত্ব এই আলোক-বর্ষ মাপকাঠির তিন চারিটা। অর্থাৎ, সেই তারা হইতে এখানে আলোক আসিতে ৩।৪ বৎসর লাগে। অথবা, যে আলোকে সেই তারা এইমাত্র দেখিলাম, তাহা ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে এদিকে আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল!

কোন জিনিস কুড়ি ইঞ্চির বদলে একুশ ইঞ্চি লম্বা বলিলেই তাহা লইয়া আমরা কত ঝগড়া করি। এখানে দুই চারি শত, দুই চারি কোটি মাইলকেও গণনার মধ্যে আনিতেছি না। নিকটস্থ তারার দূরত্ব তিন বা চারি 'আলোক-বর্ষ' বলিয়া কত কোটি মাইল অগ্রাহ্য করিতেছি। কি দারুণ কথাই হইতেছে! আমাদের নিকটস্থ তারাটির নাম শুনিতে ইচ্ছা হইবে। উহার বিলাতী নাম 'আলফা সেন্টরি', বাঙ্গালায় উহার নাম, কিন্নরী রাখা গিয়াছে। লুব্ধক তারাটি অনেকেই চিনেন। মাঘমাসে সন্ধ্যার পর পূর্ব্বাকাশে দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতে থাকে। উহার তুল্য বড় তারা আমরা আর একটি দেখি না। উহা কত দূরে শুনিবেন? এখান হইতে সূর্য্য যত দূরে, তাহার আট লক্ষ গুণ দূরে। 'আলোক-বর্ষ' মাপ-কাঠির ১২।১৩টা দূরে। উত্তর দিকস্থ ধ্রুবতারা এত দূরে যে, বোধ হয়, তাহার আলোক আসিতে পঞ্চাশ বৎসরের অধিক সময় লাগে!

আর উদাহরণের প্রয়োজন নাই। যে তারা আমাদের নিকটস্থ

বলিয়া জানা গিয়াছে, সেই কিন্নরী তারার কিন্নরী না জানি, আমাদের সূর্য্যকে কত বড় দেখিতেছে। আমাদের বিশালদেহ সূর্য্যকে রাত্রিকালে কিন্নরীগণ ধ্রুবতারার অপেক্ষা বড় দেখিবেন না। লুব্ধকের মানুষেরা উহাকে আরও ক্ষুদ্র দেখিবে।

তবে, সূর্য্যের দেহ বিশাল কই?

যদি নিকটস্থ তারা এত দূরে, না জানি দূরস্থ তারা কত দূরে আছে! যে সব তারা প্রকাণ্ড দূরবীক্ষণেও অস্পষ্ট দেখায়, না জানি সে সব কত দূরে?

আর এক প্রকারে কথাটা বুঝা যাউক। কোন্ তারা কত উজ্জ্বল দেখায়, তাহা পরিমিত হইয়াছে। প্রভা-অনুসারে সমুদয় তারা কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। লুব্ধকাদি ১৮।১৯টা তারা উজ্জ্বলতম। ইহাদিগকে প্রথম-প্রভা তারা বলা যায়। ধ্রুবতারা প্রভৃতি ৫০।৬০টি দ্বিতীয়-প্রভা তারা। এইরূপে শুধু-চোখে আমরা ষষ্ঠ-প্রভা তারা পর্য্যন্ত দেখিতে পাই।

যদি সকল তারা সমান বৃহৎ হইত, যদি সকল তারা সমান পরিমাণে আলোক বিকীর্ণ করিত, তাহা হইলে যে তারা যত অস্পষ্ট বোধ হয়, সে তারা তত দূরে আছে বলিতে পারা যাইত। কিন্তু কে জানে কোন্ তারা কত বড়; কে জানে কোন্ তারা হইতে কি পরিমাণে আলোক বিকীর্ণ হইতেছে!

এ সকল কথা জানা যায় নাই বটে, তথাপি হাজার হাজার তারা লইলে বলিতে পারা যায় যে, পঞ্চমপ্রভা তারা অপেক্ষা দশমপ্রভা তারা বহু, বহুদূরে অবস্থিত।

কিন্তু কে জানে তারাগুলা কত বড়? প্রকাণ্ড দূরবীক্ষণেও তাহাদের পরিমাণযোগ্য বিম্ব দেখা যায় না। কিরণ বিশ্লেষণদ্বারা জানা গিয়াছে যে,

তারাগুলা সূর্য্যের ন্যায় স্ব-স্ব তেজে দীপ্তিমান্। পূর্ণচন্দ্র যত আলোক দেয়, আমাদের সূর্য্য তদপেক্ষা প্রায় সাড়ে চারি লক্ষ গুণ অধিক আলোক দেয়। আর, লুব্ধক তারা যত আলোক দেয়, তদপেক্ষা পূর্ণচন্দ্র তের হাজার গুণ অধিক আলোক দেয়। তবেই, লুব্ধক অপেক্ষা সূর্য্য প্রায় ছয় শত কোটি গুণ অধিক আলোক দেয়। কিন্তু মনে করুন যেন, লুব্ধক তারাকে সূর্য্যের স্থানে আনা গেল। আট লক্ষ গুণ নিকটে আনিলে লুব্ধকের জ্যোতিঃ অনেক গুণে বর্দ্ধিত হইবে। কেন না, যেটা যত কাছে আসে, সেটা তত উজ্জ্বল হয়; কেবল 'তত' নহে, অন্তরের বর্গ যত, উজ্জ্বল তত হয়। দুই হাত দূরের দীপ এক হাত দূরে আনিলে চতুর্গুণ উজ্জ্বল হয়। এইরূপে জানা যায় যে, এখান হইতে সূর্য্য যত দূরে, লুব্ধক তত দূরে থাকিলে উহা এক শত সূর্য্যের তুল্য উজ্জ্বল দেখাইত। বোধ হয়, অনেক তারাই লুব্ধকের সমান আলোক বিকীর্ণ করে। অতএব তৎসমুদয় অন্ততঃ আমাদের সূর্য্যের ন্যায় বিশাল দেহ হইবে। বিধাতা কি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সূর্য্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন!

তবে, শুধু-চোখে আমরা আকাশে ৬।৭ হাজার তারার অধিক দেখিতে পাই না। কিন্তু একটা যৎসামান্য দূরবীক্ষণ প্রয়োগ করিলেই, যেখানে কিছুই দেখা যাইতেছিল না, সেখানে অনেক তারা দৃষ্টিগোচর হয়। যে দূরবীক্ষণে দ্বিগুণমাত্র বড় দেখায়, তাহার মধ্য দিয়া আকাশ দেখিলে তারা-সংখ্যা লক্ষাধিক হইয়া পড়ে। আমেরিকার 'লিক' মানমন্দিরে যে বৃহৎ দূরবীক্ষণ আছে, বোধ হয় তদ্দ্বারা দশ কোটি তারা দেখিতে পাওয়া যায়। আরও বড় দূরবীক্ষণ থাকিলে, আরও কত তারা দেখা যাইত! তবে, বিধাতা ব্রহ্মাণ্ডকে নিতান্ত প্রকাণ্ড করিয়াছেন! কত অসংখ্য বিশাল-দেহ তেজোময় পদার্থ লইয়া খেলা করিতেছেন! কত কোটি কোটি সূর্য্য, অসীম ব্রহ্মাণ্ডে সমুদ্রতটের বালুকার ন্যায় ইতস্ততঃ ছড়াইয়া দিয়াছেন! ব্রহ্মাণ্ডের সব

তারা যে দীপ্ত, এমনও বলিতে পারা যায় না। নিষ্প্রভ তারা আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু পরস্পর অভিঘাতে দীপ্ত হইয়া উঠিতে পারে। তখন দৃশ্যও হইতে পারে। সময়ে সময়ে 'নূতন' তারা হঠাৎ দৃষ্টিগোচর হয়, হঠাৎ নিবিয়াও যায়।

আমরা বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ঈষৎ আভাস পাইলাম। একবার ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করি। দূরবীক্ষণ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের নিকট প্রান্তে আনিয়া অগণ্য বৃহৎ রাজ্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে, অণুবীক্ষণ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের নিকটে আনিয়া তাহার রচনা-কৌশল ভাবিতে বলে। এদিকে আর এক জগৎ পড়িয়া আছে।

প্রচলিত ইঞ্চি লইয়াই প্রথমে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড মাপিতে বসি। যিনি একটা পয়সা দেখিয়াছেন, তাঁহার নিকট ইঞ্চির পরিমাণ অজ্ঞাত নাই। কোন বস্তু ছোট বলিতে হইলে, তাহা ইঞ্চির দশ ভাগের বা একশত ভাগের এক ভাগ বলিয়া থাকি। চুলের ন্যায় সরু বলিলে যেন সূক্ষ্ম পরিমাণের চরম সীমায় আসা গেল। কিন্তু মাথার চুল এতই কি সরু? উহা এক ইঞ্চির তিন শত ভাগের এক ভাগের মতন স্থূল। তবেই, তিন শত চুল পাশে পাশে রাখিলে এক ইঞ্চি চওড়া হইবে। তা ছাড়া শুধু-চোখে চুল ত স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

আমাদের রক্ত দেখিতে ঘন লাল জলের মতন বোধ হয়। কিন্তু সকলেই জানেন, উহাতে জল ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকাকণার মতন কত কায়াণু আছে। এই সকল অসংখ্য কায়াণু ঈষৎ লাল বলিয়া সমুদয় রক্ত রক্তবর্ণ দেখায়। শুধু-চোখে কায়াণু দেখিতে পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু তা বলিয়া সে গুলা এত কি সূক্ষ্ম? সে গুলা ত এক ইঞ্চির তিন হাজার ভাগের এক ভাগের মতন স্থূল।

কি আমাদের শরীর, কি পশু-পক্ষ্যাদির শরীর, আর কি গাছের শরীর,

সকল জীবশরীরই কায়াণুতুল্য ক-ল দ্বারা নির্ম্মিত। এই সকল ক-লের কোনটা মাংস, কোনটা অস্থি, কোনটা বল্কল, কোনটা বা অংশুতে পরিণত হয়। জীববিদ্‌গণকে শরীরের এই সকল ক-লের বিস্তার সর্ব্বদা মাপিতে হয়। তাঁহারা এক ইঞ্চিকে পুনঃ পুনঃ কত ভাগ করিবেন?

এই হেতু তাঁহারা একটা নূতন মাপকাঠি করিয়াছেন। ইহা এক ইঞ্চির পঁচিশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই মাপকাঠিকে তাঁহারা 'মি' বলিয়া থাকেন। আমাদের মাথায় চুল এই মাপকাঠির ৮০টার সমান মোটা, রক্তের কায়াণু ইহার ৮।৯টার সমান চওড়া।

লৌহসূচীর সূক্ষ্ম অগ্রভাগে কত জন পরী এককালে নৃত্য করিতে পারে, পূর্ব্বকালে পশ্চিম দেশে এই প্রশ্ন লইয়া না-কি মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছিল। আজকাল অণুজীববিদ্‌গণের মধ্যে ঐরূপ একটা প্রশ্ন লইয়া গোলমাল হইয়া থাকে। তাঁহারা সূচ্যগ্রে লম্বিত একবিন্দু জলে কেবল জল দেখেন না; তাহাতে অসংখ্য অণুপ্রমাণ জীব বিচরণ করিতে দেখেন। এই সকল জীব জীবের অণু নহে, অণুপ্রমাণ জীব। এই হেতু নাম অণুজীব। ইহাদিগেরও গণ-বিভাগ ও জাতি-বিভাগ আছে। কয়েক জাতি আমাদের কতিপয় রোগের নিদান। এই জন্য অণুজীববিদ্‌গণ বায়ুতে, জলে, খাদ্যে অণুজীব গণিয়া বেড়ান।

আমাদের নিকট পৃথিবীটা যত বড় বোধ হয়, এই সকল অণুজীবের পক্ষে এক বিন্দু জল তত বড় বোধ হয়। ইহারা আহার করে, ভক্ষ্য জীর্ণ করিয়া শরীরে শোষণ করে। ইহাদেরও শরীরে, আমাদের শরীরের রক্তের মতন, কোন প্রকার রস ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়।

অনেক অণুজীবের শরীর কিন্তু উক্ত 'মি' মাপকাঠির একটারও সমান নয়। লম্বাতেই একটারও সমান হয় না, মোটার ত কথাই নাই। অনেক-গুলার শরীর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বটে, কিন্তু আড়ে 'মি' মাপকাঠিতেও পাওয়া

যায় না। কতকগুলার শরীরে আবার লোম আছে। কোনটার দুইটিমাত্র, কোনটার বা গোছা গোছা লোম; কোনটার প্রায় সর্ব্বাঙ্গ লোমে আচ্ছন্ন।

এই সকল লোম বড় অণুবীক্ষণেও প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু শরীরের সঙ্গে এই সকল লোমের যোগ আছে। যোগ কেন, লোমগুলা লইয়াই তাহাদের দেহ। দেহের রস এই সকল লোমকে পুষ্ট করিতেছে, লোমের মধ্যেও কোন প্রকার রস যাতায়াত করিতেছে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কারণও তন্মধ্যে বর্ত্তমান আছে।

এই সকল অণুপ্রমাণ জীবেরও তনয় হয়; জনকের ধর্ম্ম সন্তানে বর্ত্তে; না জানি জনকের কি সূক্ষ্ম পদার্থদ্বারা সন্তানের শরীর গঠিত হয়! অণুপ্রমাণ জীবের মধ্যে না জানি কি জড়ময় অণু-পরমাণুর বিন্যাস পরিবর্ত্তিত হইতেছে!

যে জলবিন্দুতে সহস্র অণুজীবের বিচরণ-স্থান হইতেছে, সেই জলের অণুগুলা তবে আরও ক্ষুদ্র। বস্তুতঃ এক ফোঁটা জল আট হাজার মাইল ব্যাসবিশিষ্ট একটা পৃথিবীর মতন বৃহৎ কল্পনা করিলে,* জলের অণু কমলানেবু অপেক্ষাও বড় হইবে না। ইহাতেই ভাবুন, এক ফোঁটা জলে কত অণু আছে, এবং একটা অণুই বা কত বড়।

বায়ু কত তরল পদার্থ। কিন্তু এক-ঘন-ইঞ্চি বায়ুতে নাকি ৩×১০^{২০}, এতগুলি (অর্থাৎ তিনের পর কুড়িটা শূন্য বসাইলে যত হয়, ততগুলি) জড়ময় অণু বর্ত্তমান! তাহাদের মধ্যেও ফাঁক আছে, সেই ফাঁকে অণুগুলি ইতস্ততঃ স্পন্দিত হইবার স্থান পাইতেছে। ইঞ্চির হিসাবে অণুর পরিমাণ শুনিতে চান? একএকটা নাকি এক ইঞ্চির ৪০।৫০ কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র! কিন্তু অণুও শেষ সীমা নহে। উহারও অবয়ব আছে। সে অবয়ব প-র-মা-ণু, কি তা-ড়ি-তা-ণু, কি আ-কা-শা-ণু, কে জানে!

কিন্তু অণুসমূহের মাঝের সেই ফাঁকা স্থানই কি বাস্তবিক ফাঁক? তাহাও যে আকাশ বা ঈথর নামক পদার্থে পরিব্যাপ্ত। যেমন যাবতীয় জীবদেহের অণু জলমধ্যে ব্যাপ্ত আছে, তেমনই এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থে অণুময় স্থাবর-জঙ্গম-বিশ্ব-চরাচর সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। কোথায় নভোমণ্ডলে তারা, আর কোথায় আমরা! এই সূক্ষ্ম পদার্থ, তারাগণের সহিত আমাদের যোগ ঘটাইয়াছে। বোধ হয় ইহাই মাধ্যাকর্ষণাদি যাবতীয় শক্তির আধার। ইহারই কম্পনে আমাদের চক্ষে রক্ত-পীতাদি বর্ণের উৎপত্তি। ইহারই তরঙ্গাভিঘাতে বজ্রপাণির বজ্রের উৎপত্তি।

এই সূক্ষ্ম পদার্থের তরঙ্গের বিস্তার মাপিতে জড়বিদ্‌গণ একটা তদুপযুক্ত সূক্ষ্ম মাপকাঠি গ্রহণ করিয়াছেন। ইঞ্চি লইলে চলে না। এই হেতু তাঁহারা এক ইঞ্চিকে পঁচিশ কোটি ভাগে ভাগ করিয়া তাহার একভাগকে মাপকাঠি করিয়াছেন। আকাশ-পদার্থের এক প্রকার কম্পনে আমাদের রক্তবর্ণ আলোকের জ্ঞান হয়। কিন্তু আকাশ-পদার্থে এজন্য যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহার বিস্তার এই নূতন মাপকাঠির ৬।৭ হাজার মাত্র। ইঞ্চির হিসাবে বলিতে হইলে, তাহার বিস্তার এক ইঞ্চির চল্লিশ সহস্র ভাগের এক ভাগ মাত্র।

এইরূপ, প্রতি শাস্ত্রেই শাস্ত্রোপযুক্ত মাপকাঠির প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু সকলেই অতি বৃহৎ ও অতি ক্ষুদ্রের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে। এক দিকে এত বৃহৎ যে কল্পনা করিতে মস্তক ঘূর্ণিত হয়, অন্য দিকে এত ক্ষুদ্র যে মনে হয় যেন তৎসমুদয় বস্তুতঃ নাই। সাংসারিক ব্যাপারে আমরা ইঞ্চি-গজ-মাইল লইয়াই তুষ্ট। কিন্তু ভবের হাটে ভবানীর হাঁড়ী-কুঁড়ী এক এক ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ড অতি বৃহৎ ও অতি ক্ষুদ্র; এত বৃহৎ, এত ক্ষুদ্র, যে পরিমাণে দুই দশটা শূন্য বাড়াইয়া কিংবা কমাইয়া দিলে প্রভেদ বুঝিতে পারি না।

সূক্ষ্ম জগতে বিধাতার অণিমা এবং স্থূল জগতে তাঁহার মহিমা প্রকটিত রহিয়াছে। ঐ দুই শক্তির স্থূল আভাস পাওয়াও সাধ্য নহে। কে জানে কত সূক্ষ্ম আছে, কে জানে কত স্থূল আছে? আমাদের যত কিছু নাড়াচাড়া বিদ্যাবুদ্ধি, পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। কে জানে মানুষ অপেক্ষা উন্নততর জীবের নিকট ব্রহ্মাণ্ড কিরূপ দেখায়, কে জানে অস্ফুটেন্দ্রিয় শুক্তির নিকট মুক্তাকণা কি প্রকার বোধ হয়? কে জানে আর দুই চারিটা ইন্দ্রিয় থাকিলে আরও কি রহস্য জানা যাইত?

জড় ও শক্তির পরিমাণ লইয়া আমরা ব্যস্ত। কিন্তু জড় ও শক্তি প্রকৃতির একাঙ্গ মাত্র। আর এক বিচিত্র অঙ্গ লইয়া পুরাকাল হইতে অদ্যাবধি লোকে কত বিতণ্ডাই করিতেছে। হয়ত জড় ও শক্তি, এক বই দুই নয়; হয়ত জড় ও চিৎ একেরই দ্বিবিধ প্রকাশমাত্র। ক্ষুদ্র ও বৃহতের পরিমাণ নিমিত্তে আমরা নূতন নূতন মাপকাঠি করিতেছি, কিন্তু চিতের পরিমাণ নিমিত্তে কি প্রকার মাপকাঠি করা যাইবে?

কলা গাছ

আমাদের দেশে বহু সুঠাম গাছ আছে। দেখিবার চোখ থাকিলে, সব গাছই সুন্দর। কিন্তু সে চোখ না থাকিলেও কলাগাছ সুন্দর। কলাগাছের বন তেমন সুন্দর দেখায় না। যে গাছ একটী উঠিয়াছে, রসা মাটি পাইয়াছে, অল্প কাল প্রখর রৌদ ভোগ করে, চারি পাশে দুই চারিটি চারা বাহির হইয়াছে, যেন পুত্রিকা-পরিবৃত হইয়া ঘর-সংসার পাতিয়াছে, সে কলাগাছ যেমন সুঠাম সুন্দর, অন্য গাছ তেমন নহে।

কেন সুন্দর দেখায়, কে জানে। কবি কদলীর সহিত সুন্দরী যুবতীর উরুর উপমা করেন। কলাগাছের গোড়া হইতে উপরদিক ক্রমশঃ সরু। কেবল সরু নহে; দেহে বলন আছে, যেন মানুষের দেহের পেশীর বলন। বোধ হয় কাঁচকলার গাছ লক্ষ্য হইয়াছিল। বর্ণ ঈষৎ পীত, যেন গৌরী। মাথায় শ্যামল চিক্কণ দীর্ঘ পাতা, চারিদিকে একটু নুইয়া পড়িয়াছে, উপরের পাতা অল্প নুইয়াছে, মাঝের পাতা একটু হেলিয়া দাঁড়াইয়াছে। মন দিয়া দেখিলে জানা যায়, পাতাগুলি কুণ্ডলাকারে বেড়িয়া বেড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে একটা ক্রম আছে। এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয়, পরে পরে গণিয়া গেলে ছয়ের পাতা একের উপরে স্থাপিত দেখি। যে কোন পাতা ধরিয়া গণিয়া গেলে এই বিন্যাস দেখা যায়। গাছের উপর হইতে দেখিলে পাতাগুলি থরে থরে সাজান দেখায়, পাঁচটি থর পাঁচদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দেহের বলন, বর্ণ; পাতার বর্ণ, বিস্তার, বিন্যাস, অবনমন; বোধ হয় এই সব কারণে কলাগাছ সুন্দর সুঠাম দেখায়।

আরও কথা আছে। এত বড় গাছ, এত পাতা, এত ভারী; কোথাও একটু কাঠ নাই! কাঠ প্রায় রসহীন, কঠিন। কলাগাছ রসাল কোমল। আম-গাছ, বট-গাছ, তাল-গাছ, প্রভৃতি যে গাছই দেখি, তাহার গোড়া হইতে কাঠের গুঁড়ি উঠিয়াছে। কলাগাছের গুঁড়ি নাই, ডাল নাই; অথচ এক একটা দশ বার হাত উচা হয়। যাহা গুঁড়ির মতন দেখায়, তাহা পাতার গোড়া, গায়ে গায়ে পুর করিয়া বেড়িয়া থাকে বলিয়া তেমন দেখায়। মাটির নীচে কলাগাছের গুঁড়ি লুকান থাকে। ইহাকে আঁঠিয়া বলে। এই আঁঠিয়ার এক প্রান্ত হইতে পাতা উঠে। আদা, হলুদ, কচু, কমল, কুমুদ প্রভৃতিরও এইরূপ আঁঠিয়া থাকে। আঁঠির মতন দেখিতে বলিয়া আঁঠিয়া নাম হইয়াছে। আঁঠিয়ার গা হইতে মোটা দোড়ীর মতন শিকড় নামিয়া গাছটাকে ধরিয়া রাখে। উপরে পাতার লম্বা বোঁটা খোল হইয়া কুণ্ডলাকারে বেড়িয়া বেড়িয়া মিথ্যা গুঁড়ির আকার ধরে। পরস্পর আবরণ করে বলিয়া বোঁটার নাম বাসনা হইয়াছে। বাসন শব্দ সংস্কৃত; উহার অর্থ আবরণ। তাহা হইলে যাহাকে কলাগাছ বলি, তাহা কতকগুলি পাতা ও বাসনার সমষ্টি মাত্র।

কলাগাছের বয়স হইলে আঁঠিয়া হইতেই বাসনার মাঝ দিয়া একটা দীর্ঘ বোঁটা উঠে। উহার ডগায় গোছা গোছা ফুল ধরে। এই দীর্ঘ বোঁটাকে আমরা থোড়, এবং পুষ্প-মঞ্জরীকে মোচা বলি। ফুলগুলি সাপের ফণার আকারে পরে পরে, থরে থরে সাজান থাকে; প্রতি ফণার এক এক রক্তবর্ণ খোল ভিতরের কোমল ফুলগুলিকে রক্ষা করে। কলার ফুল সুন্দর নহে; ফুলের খোল সুন্দর, যেন নৌকার খোল। ফুলের নীচের দিকটা পুষ্ট হইয়া ফল হয়, তখন মাথার পাগড়ী দুইটা শুখাইয়া যায়। পাথড়ীর ভিতরে পাঁচটা, কদাচিৎ ছয়টা, মোটা সূতা; সবার মাঝে আর একটা। এই মাঝের সূতাটা গর্ভ-কেশর; নীচের ফলের সহিত ইহার যোগ থাকে।

বাহিরের পাঁচটা সূতা পরাগ-কেশর। কেশের তুল্য বলিয়া নাম কেশর। গর্ভ-কেশরের মাথায় আঠা থাকে, পরাগ-কেশরের লম্বা মাথার ভিতরে সূক্ষ্ম শাদা ধূলা থাকে। এই ধূলার নাম পরাগ। গর্ভ-কেশরের নীচের অংশ যেটা পরে ফল হয়, সেটার নাম গর্ভাশয়। যখন পেটে ছেলে থাকে, তখন তাহাকে গর্ভ বলে; যে ঘরে থাকে তাহাকে গর্ভের আশয়,—ছেলের ঘর বলে। গাছের গর্ভ পুষ্ট হইয়া বীজ হয়। বীজই গাছের ছেলে। যে ফুলে গর্ভাশয় থাকে না, তাহাতে ফল হয় না। সে ফুল বাঁঝা। লাউ কুমড়ার বাঁঝা ফুল সবাই জানে, সে ফুলে গর্ভাশয় থাকে না। কলার সব ফুলেই গর্ভাশয় থাকে; কিন্তু মঞ্জরীর গোড়ার ফুলগুলি হইতেই ফল হয়, শেষের দিকের হয় না। যখন হয় না, তখন মোচা কাটিয়া ঘণ্ট রাঁধিয়া খাইলে ফলে কম হয় না। বরং ভালই হয়। যে পুষ্টিকর রস এই সব ফুলে যাইত কিন্তু ফল দিত না, সে রস অন্য গর্ভাশয়ে গিয়া ফলকে পুষ্ট করে। চাষের গাছের কলায় বীজ প্রায়ই হয় না। বীজের কাল খোসাটা থাকে, বীজ থাকে না। বুনো গাছের বীজ হয়। সে বীজ হইতে গাছও হয়।

আর এক উপায়ে চারা হয়। আঁঠিয়া হইতে পুকী বাহির হয়, পুকী মাটির উপর উঠিয়া চারা হয়। সংস্কৃতে যাহা পুত্রিকা, বাঙ্গালায় তাহা পুকী নাম পাইয়াছে। ছোট কন্যার নাম পুত্রিকা, কলা গাছের কন্যা। ফল পাকিবার পর কলাগাছ শুখাইয়া মরিয়া যায়; এক বছরের মধ্যেই কলাগাছের আয়ু শেষ হয়। তখন পুকী বড় হইয়া উঠে, ক্রমে ঘর-সংসার পাতে। এই কারণে কলাগাছের ঝাড় হয়।

যে গাছের আয়ু এক বছর, অথচ যাহাকে বড় ও মোটা হইতে হইবে, তাহাতে কাঠ জন্মিবার অবসর হয় না, প্রয়োজনও হয় না। সে গাছ জল-ভস্‌কা হইবেই। জল ও বায়ু-পূর্ণ হইলে জল-ভস্‌কা বলি। বর্ষায়

শাক মাত্রেই জল-ভস্‌কা। জল-ভস্‌কা বলিয়া কলাগাছের সংস্কৃত নাম ক-দ-লী। কদলীশব্দের 'ক' অর্থে জল, 'ক' অর্থে বায়ু। প্রচুর জল ও বায় শোষণ করে বলিয়া নাম। কদলীর আর এক নাম ক-দ-ল-ক। ক-দ-ল-ক নাম হইতে ক-লা নাম। কলাগাছ কাটিলে কাটা মুখদিয়া জল ঝরিতে থাকে, গাছ বিঁধিয়া দিলে টস্ টস্ করিয়া রস গড়ায়। কলাবাসনায় এত জল যে একসের কাঁচা বাসনা শুখাইলে এক ছটাক হয়! প্রচুর বায়ুও থাকে। একটু বাসনা কাটিয়া জলে ফেলিলে ভাসিতে থাকে, ডুবাইয়া বিঁধিয়া দিলে জলে বুদ্‌বুদ্‌ উঠে। বাসনার গা মসৃণ; কিন্তু ভিতরে অসংখ্য কুঠরী। কুঠরীর কাঁথে কাঁথে জল, ভিতরে বায়ু।

কলাগাছ এত জল কোথায় পায়? একটু রসা মাটিতে, যে মাটিতে বালি মিশিয়া আছে, সেই রসা বালিয়া মাটি-ই কলাগাছের মাটি। নদীর ধারের পলিমাটি, এই রূপ। মাটির সহিত লতা-পাতা-পচা মিশিলে আরও ভাল। পুরাতন পুকুরের পাঁক তুলিয়া অনেকে সে মাটিতে কলাগাছ করে। এই পাঁকে লতা-পাতা-পচা থাকে। পাঁকের অভাবে পচাগোবর দিতে হয়। শিকড় দিয়া মাটির রস শুষিয়া কলাগাছের রস। এই রস লোণতা-কষা। কষা-ই বেশী, লোণতা কম। কষা রসে লোহা পড়িলে কালী হয়। কাটারী, বঁটি, ছুরি, যে লোহা দিয়া কলাগাছের যেখানটাই কাটি, কালী হয়। লোহার তাওয়ায় কাঁচাকলা ভাজিলে সেই কালী হয়।

যে গাছের এত জল চাই, সে গাছ বর্ষাকালেই বাড়িতে পারে। এ সময়ে কলাগাছ নূতন পাতা ফেলিতে থাকে, দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠে, এই কারণে বর্ষাকাল-ই কলা রুইবার সময়। অন্য সময়ে রুইলে জলসেচন আবশ্যক। শিকড় বেশী নীচে যায় না, পাশে লম্বা হইয়া বেশী দূরেও যায় না। এই হেতু গোড়ার কাছে, আঁঠিয়ার পাশে জল পাইলে গাছের বৃদ্ধি, গাছের মঙ্গল। প্রকৃতিও মঙ্গল বিধান করিয়াছেন, জল-সংগ্রহের

বিধান করিয়াছেন। সব মাঝের কচিপাতা তারের আঙ্গটীর আকারে গুটাইয়া থাকে। যে পাতা বয়সে একটু বড়, সে খোলের কিংবা কুলার আকারে মেলিয়া ঈষৎ হেলিয়া দাঁড়ায়; বর্ষার জল সব গড়াইয়া গোড়ায় ঢালে, যেন জল সেচিতে থাকে। মধ্যশিরার নালী, বাসনার নালী দিয়া ঠিক আঁঠিয়ার উপরে ফেলে। যে পাতা বয়সে আরও বড়, সে বর্ষার খানিক জল নালী দিয়া গোড়ায় ঢালে, খানিক গোড়ার পাশের মাটিতে ফেলে। উপরে পাতা থাকাতে, নীচের পাতায় জল বেশী পড়ে না, তাহাকে মেলিয়া থাকিতেও হয় না, মধ্যশিরার দুই পাশে ঝুলিয়া পড়ে।

জলের সঞ্চয় দেখা গেল। বায়ুর সঞ্চয় দেখি। পাতা ও বাসনার ভিতরে কোন্ পথে বায়ু ঢোকে? মাটির রসে বায়ু কিছু মিশিয়া থাকে, রসের সঙ্গে বায়ুও কিছু উঠে—কিন্তু বেশী নয়; মাটির রসে বায়ু বেশী থাকে না। তাহা হইলে বাহিরের বায়ু গাছে প্রবেশ করে। শুধু চোখে বায়ুপ্রবেশদ্বার দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পাতায় অসংখ্য রন্ধ্র দেখিতে পাওয়া যায়। উষ্ণ জলে একটু কলা পাতা ডুবাইয়া ধরিলে পাতার পিঠে অসংখ্য বুদ্‌বুদ্ উঠে। জলের তাপে ভিতরের বায়ু ফুলিয়া কিছু কিছু বাহির হয়। উপরের পিঠে উঠেনা, সব নীচের পিঠে উঠে। বাস্তবিক অণুবীক্ষণে দেখিলে উপরের পিঠে যেখানে পাঁচটা রন্ধ্র, নীচের পিঠে সেখানে পঁচিশ ত্রিশটা দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট পটোল দুইখণ্ডে চিরিলে চেরা মুখ যেমন দেখায়, রন্ধ্রগুলি তেমন। এগুলিকে গাছের নাক বলিতে পারা যায়। এই নাসাদিয়া গাছের নিশ্বাসপ্রশ্বাস চলে, বাহিরের নির্ম্মল বায়ু দেহে প্রবেশ করে, দেহের সমল বায়ু নির্গত হয়। যত বায়ু ঢোকে সব বাহির হয় না, অনেকটা ভিতরে থাকিয়া ছোট ছোট কুঠরী গুলিকে ফাঁপাইয়া রাখে।

পাতায় অসংখ্য নাসা আছে, সুতরাং বর্ষার জল ঢুকিয়া গাছকে

হাঁপাইয়া মারিতেও পারে। এ আশঙ্কা কম নহে। এখানে প্রকৃতি এক কৌশল করিয়াছেন। আমাদের নাকের কপাট আঁটা; ইচ্ছা করিলেও নাকের রন্ধ্র বুজাইতে পারি না। গাছের নাসারও দুই পাশে দুই কপাট আছে, যেন আল্‌মারির দুই পাশের টানা কপাট, কিছু ফোলা; দুই কপাট মাঝের দিকে টানিয়া আনিলে দ্বার রুদ্ধ হয়। গাছের নাসায় জল পড়িলে দুই পাশের দুই কপাট ফুলিয়া নাসাদ্বার রুদ্ধ করে, জল থামিলে আপনি খুলিয়া যায়। পাতার উপর-পিঠের নাসা সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়; সে পিঠের দিকে ভিতরে বায়ুর কুঠরীও নাই; তাই উষ্ণ জলে ফেলিলে সে পিঠে বুদ্‌বুদ্ উঠে না। নীচের পিঠের দিকের কুঠরী হইতে উঠে।

নাসা চাই; কিন্তু যে পিঠে জল লাগেনা, সে পিঠে বেশী। কমল কুমুদের পাতা জলে ভাসে; এই পাতার নীচের পিঠে নাসা নাই, সব উপরের পিঠে। প্রথমে মনে হয়, কলাপাতার উপরপিঠে নাসা একটীও না থাকিলে ভাল হইত। কিন্তু জলপ্রবেশ রোধ করিতে গিয়া বায়ু-প্রবেশও রোধ করা হইত। বৃষ্টি সর্ব্বদা হয় না, পাতা জলে ডুবিয়াও থাকে না। বায়ু ও মাটির রস এই দুই নইলে গাছ বাঁচিতেই পারে না। রোদ নইলেও পারে না। কিন্তু সে সব কথা এখন থাক্।

এত করিয়াও প্রকৃতি তুষ্ট নহেন, কচি পাতা ও বুড়া পাতায় তেল মাখাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। তেলা পাতায় জল দাঁড়ায় না, গড়াইয়া পড়ে। কমল কুমুদ জলে বাস করে, তাহাদের পাতার উপরপিঠ আরও তেলা। কলাপাতা কাপড়ে ঘাষলে তেল উঠিয়া যায়, তখন তাহাতে জল লাগে। বুড়া পাতা অপেক্ষা কচি পাতায় তেল বেশী। সে পাতা যে কাঁচ শিশু, অল্পেই কষ্ট পায়। তা ছাড়া কচি পাতাকে আকাশের জল ধরিয়া গোড়ায় ঢালিতে হয়; বুড়া পাতাকে হয় না। সে পাতা

মাঝে দুই পাশে বাঁকিয়া ঝুলিতে থাকে। কচি পাতার নীচের পিঠেও ত বর্ষার জল লাগে; বর্ষাবিন্দু ঠিক সোজা পড়ে না, বর্ষার সময় বাতাস দেয়, ঝাপ্‌টাও লাগে। এখানে প্রকৃতি তেলেও সন্তুষ্ট হন নাই, নীচের পিঠে যেখানে নাসা আছে, সে পিঠে মোম মাখাইয়া দিয়াছেন, গায়ে জল আদৌ দাঁড়ায় না। নাসা না থাকিলেও জলে ভিজিয়া ভিজিয়া পাতা পচিয়া যাইত। বাসনায় নাসা এখানে ওখানে দুইটা একটা মাত্র; কিন্তু বর্ষার জলে ভেজে। ইহাতে বাসনা পচিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু মোম থাকাতে জল দাঁড়ায় না।

বায়ু চাই, কিন্তু ঝড়ঝাপ্‌টা চাই না। ঝড়ে কলাগাছ যত পড়ে, অন্য গাছ তত পড়ে না। পড়িবারই কথা। ভস্‌কা মাটি, ভাসা শিকড়, পাতা লম্বা ও চওড়া। ঝড়ে পড়িতে হইলে এমন যোগ আর হইতে পারে না। অথচ সে সব নইলেও নয়। পাতা সরু সরু হইলে ঝড় লাগে না। এইহেতু কলাপাতা একটু বড় হইলে নিজে নিজে চিরিয়া সরু সরু কানির মতন ঝুলিতে থাকে। লোকে মনে করে, বাতাসে কলাপাতা চিরিয়া যায়। কিছু যায় বটে, কিন্তু অধিক নিজে নিজেই চেরে। গুঁড়ি নাই; যাহা আছে, তাহা কোমল, জল ও বায়ুপূর্ণ বাসনার বেষ্টন। এস্থলে বাসনা-খোল হইয়া কতকটা দৃঢ় হইয়াছে। চেপ্‌টা হইলে কিংবা সমান পুরু হইলে সহজে বাঁকিয়া পড়িত। বাঁশ ফাঁপা, কিন্তু সহজে ভাঙ্গিয়া পড়ে না; বাঁসের ওজনের নিরাট গুঁড়ি হইলে কিংবা গোল না হইয়া চউকা হইলে সহজে ভাঙ্গিয়া পড়িত। কলাপাতা চিরিয়া যায়, বাসনা-খোল তথাপি ঝড়ে উপড়িয়া পড়িতে পারে। একানিয়া গাছ সহজে উপড়িয়া পড়ে; কিন্তু ঝাড়ের গাছ তত সহজে পড়ে না, পরস্পর ঠেলাঠেলি করিয়া ঝড়ের সহিত যুদ্ধ করে। যদি বা একটা পড়ে, আর পাঁচটা বাঁচে। গোরু বাছুরও কলাঝাড়ের সব গাছ

নষ্ট করিতে পারে না, মাঝের গুলা অল্লাধিক রক্ষা পায়। বাঁশও ঝাড় বাঁধিয়া উঠে, পরস্পর লাগালাগি হইয়া উচা ও দৃঢ় হইয়া দাঁড়ায়, ঝড়ে ঝাড়কে ঝাড় উঁপড়াইতে পারে না। যে দুর্ব্বল, সে একা একা তিষ্ঠিতে পারে না একথা ঠিক।

ঝাড় বাঁধিয়া দাঁড়ায়, তাহাতে কলা-গাছ ঝড় হইতে কতকটা রক্ষা পায়। কিন্তু তাহাতে আমরা মনের মতন বড় বড় কলা পাই না। অল্প স্থানে অনেক গাছ জন্মিলে সকলের ভাগ্যে প্রচুর আহার জোটে না, সকলের দেহে আবশ্যক রোদ লাগে না, দেহ হইতে নির্গত দূষিত বায়ুতে স্বাস্থ্যও থাকিতে পারে না। ফল পাকিলে গাছ মরিয়া যায়, অঁাঠিয়াও মরিয়া পচিতে থাকে। পচা অঁাঠিয়াতে কলাগাছের অহিত হয়। রক্ষা এই, পুকীগুলি বাহির দিকে বাহির হয়, ভিতর দিকে হয় না। তথাপি মরা পচা অঁাঠিয়া যতদিন মাটি না হয়, ততদিন বিষের কাজ করে। মানুষের বেলাতেও তাই। কুটুম্ব-পোষ্য বাড়িলে ভিটায় স্থান হয় না; সে ভিটায় থাকিলে পরস্পর কলহ হয়, স্থানাভাবে দেহও ভাল থাকে না। রক্ষা এই, মানুষ নিজের ভিটা হইতেই আহার সংগ্রহ করে না; দূরে মাঠে ধান কলাই প্রভৃতি জন্মায়, কিংবা অন্য গ্রাম হইতে আনে।

কলিকাতার মতন নিবিড় নগরে লোকের গায়ের রং ফর্সা হয়। মেয়েদের রং আরও ফর্সা হয়। অনেকে এই ফর্সা রং দেখিয়া নগর-বাসের প্রশংসা করে। তাহারা নির্বোধ। গায়ের ফিকা রং স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে। এমন লোকও আছে, যাহারা মেয়ের ফর্সা রং দেখিয়া বিবাহের পাত্রী নির্বাচন করে; কিন্তু বোঝে না, সে মেয়ে রুগ্না। গায়ে রোদ বাতাস না লাগাতে রক্ত ফিকা হয়। গাঁয়ে রোদ বাতাসের অভাব নাই; দেহ মলিন দেখাইতে পারে, কিন্তু সুস্থ ও সবল। শহরের লোক আওতায় বাস করে।

রোদ না পাইলে গাছও বিবর্ণ হয়, পীতবর্ণ হয়। ঘাসের উপরে ইট বা শরা চাপা দিয়া রাখিলে দিন কয়েক পরে ঘাস ফেকাসা হয়, দুর্ব্বাদল-শ্যাম-বর্ণ গিয়া পাণ্ডু-বর্ণ হয়। চাপা সরাইয়া আবার রোদ লাগিতে দিলে পূর্ব্বের শ্যাম বর্ণ ফিরিয়া আসে, স্বাস্থ্যের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কলাগাছেও ইহার অন্যথা হয় না। গাছের একটা পাতায় কাঠের পাতলা পাটা কিংবা পুরু কাগজের পাটা চাপা দিয়া রাখিলে পাঁচ সাতদিনের মধ্যে চাপা স্থান বিবর্ণ হয়। পূর্ব্বকালে, পূর্ব্বকাল কেন, একালেও ধান দূর্ব্বা দিয়া ব্রাহ্মণে আশীর্ব্বাদ করেন। ধান—লক্ষ্মী, দূর্ব্বা—স্বাস্থ্য। নবদূর্ব্বাদলের মনোহর কান্তি ইট-চাপা দূর্ব্বায় নাই। যবাঙ্কুর দিয়াও আশীর্ব্বাদের রীতি আছে। যবের অঙ্কুর লক্ষ্মী ও স্বাস্থ্যের সূচনা করে। অনেকে বোঝে না, হাঁড়ীর ভিতরে যব অঙ্কুরিত করিয়া যবের সেই পাণ্ডুবর্ণ চারা দিয়া আশীর্ব্বাদ করে। হাঁড়ীর ভিতরে মাটি জল দিয়া যব বোনে, মুখে শরা চাপা দিয়া রাখে, চারাগুলা সরু সরু লম্বা লম্বা হইয়া উঠে।

দু-তলা বাড়ীর উত্তর দিকে, কিংবা তিন চারি দিকে ঘেরা স্থানে যে গাছ জন্মে, সেখানে রোদ পড়ে না, বাতাস খেলে না, সে খানে গাছ লম্বা সরু হইয়া উঠে। রোদ না পাইলে গাছ বিবর্ণ হয়, লম্বা হয়, সরু হয়। লম্বা হইতে হইলে সরু হইতেই হয়।

লম্বা হইলেই তাহার মঙ্গল। পাঁচিলের পাশের গাছ লম্বা হয়; লম্বা হইয়া যে দিকে আলো আসে, সে দিকে বাঁকিয়া যায়। সব গাছেরই এই ধরণ, এই প্রবৃত্তি যেন আলো নইলে বাঁচেনা। শরা-চাপা হাঁড়ীর যবাঙ্কুর অকালে মরিয়া যায়। অসুস্থ হইয়া কতদিন বাঁচিতে পারে? ধনী বিলাসী কুণ্ডে গাছ রুইয়া ঘরের ভিতরে ও বারাণ্ডায় রাখেন;—কি-না ঘরের শোভা হইবে! কিন্তু বিবর্ণ রোগীর সমাগমে যেমন

হাসপাতাল হয়, কান্তি-পুষ্টির লেশ দেখিতে পাওয়া যায় না, বারাণ্ডার আওতার গাছেও তেমন হাসপাতাল মনে হয়। এই সব জীবন্মৃত গাছের বদলে সোলার কিংবা কাগজের গাছ দিয়া ঘর বারাণ্ডা সাজাইলে শোভার হানি হইত না।

ঘরের গাছ রোদ বাতাস পায় না; আহারও পায় না। কারণ আহার পাইলে বাড়িয়া উঠিত, কুণ্ড ফাটাইয়া ফেলিত। কুণ্ডে মাটি থাকে বটে, তাহাতে জল দেওয়া হয় সত্য, তবু ত গাছ বাড়ে না। আহার বলিতে ভোজ্য-গ্রহণ। গাছের ভোজ্য কি, যাহা গ্রহণ করিয়া গাছ বড় হয়? গাছ আহার করে, তাহা সবাই জানে! আহার না করিলে বীজের বৃক্ষ-শিশু বাড়িয়া উঠিতে পারিত না, ডাল-পালা ফুল-ফল কিছুই হইত না। সে সব মাটি নহে, জল নহে, বায়ুও নহে। গাছের কাঠ বাকল পাতা ফুল ফল মাটির নীচে পোতা নাই যে কোনও রকমে সে সব গায়ে জুড়িয়া যাইবে। আখের গুড়, ধানের চা'ল, কলাইর ডা'ল, তিল-সরিষার তেল, তাল-কলার কাঁদি, যাহাই দেখি না, এ সব আগে থাকে না, পরে জন্মে। গাছই ত জন্মায়। জন্মায়—খায়; খাইয়া—বড় হয়। এসব মাটিতে পায় না, জলে পায় না, বায়ুতে পায় না। নিজেরা করে, নিজেরা খায়। প্রকৃতির কি রহস্য কে জানে। আমরা জানি রোদ-বায়ু লাগিলে, মাটি-ধোয়া রস পাইলে গাছ বাড়ে, ডাল-পালা ফুল-ফল ধরে। মাটি, জল, বায়ু, রোদ, ইহার একটির অভাব হইলে গাছের জীবন-নিবৃত্তি হয়। আওতার গাছ লম্বা হয়, রোদ চায়। কুমড়া গাছ মাচায় উঠে, চালে চড়ে; মুক্ত-বায়ু মুক্ত-রোদ পাইবার আশায় উঠে। জীবন-প্রবৃত্তির বশে উঠে; গাছের ধর্ম্মই এই। কলাগাছ রোদের দিকে পাতা বিছাইয়া দেয়, এমন বিছায় যে পাতার ছায়ায় পাতা থাকে না। পাঁচ থরে সাজানতে ভালই হইয়াছে। গাছের জীবন-প্রবৃত্তি জানি বলিয়া

আমরা বাগানের বন কাটি; কারণ বন থাকিলে বায়ু-চলাচল রোধ হয়। শুধু বালিতে গাছ বাড়ে না; হাজার জল ঢালি, বাড়ে না; কারণ সে জল মাটি-ধোয়ানি নয়। যে-সে মাটি-ধোয়া জল হইলেও হয় না; যে মাটি-ধোয়া জল গাছে চায়, গাছের গোড়ায় সেই মাটি থাকা চাই। ক্ষেতে বছর বছর ধান, কলাই, আখ, বেগুন ইত্যাদি জন্মাইতেছি। ইহাদের আবশ্যক মাটির ভাগ কমিয়া যায়; গাছ হয়, কিন্তু বাড়ে না, ফলে না। তাই সার দিতে হয়।

বাড়ীতে উৎসব হইলে দ্বারে ফলন্ত কলা-গাছ রোপিত হয়। একে কোমল রসাল শ্যামল গাছ; তার উপর ফলবান্। শোভা, কান্তি, পুষ্টি, ঋদ্ধি, একা ধারে সব বর্ত্তমান। আমাদের চোক খরিয়া গিয়াছে; তাই এমন গাছ থাকিতে উৎসবের আসর সাজাইতে অসুস্থ বিবর্ণ গাছের অন্বেষণ করি, শুখনা প্রাণহীন কাগজের মালা গাঁথিয়া আনন্দের আশা করি। আসর সাজান কৃত্রিম, উৎসব কৃত্রিম, নিমন্ত্রিত বন্ধুগণও কৃত্রিম হাস্যে আতিথ্য গ্রহণ করেন। ধনীর বাগানে বিদেশী গাছ বহু কষ্টে বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছে; সেখানে সুঠাম কলা গাছের স্থান নাই! নগরিয়া জনের চোখ এমনই নষ্ট হইয়াছে। গ্রামে গেলে নষ্ট-চোখ উদ্ধার হয়, উৎসবগৃহদ্বারে পূর্ণ-কুম্ভ কদলী-বৃক্ষ দেখিতে পাই, প্রাঙ্গণে আম্রপল্লবের মাল্য মাথায় স্পর্শ করি; রসুনচৌকীর বাদ্যে, গৃহীর ব্যস্ততায় হারান প্রাণ খুজিয়া পাই। আশ্বিন মাসের দুর্গা-পূজায় কলা-বউ দেখিয়াছি। সে বউ কদলী নহে; কিন্তু কদলী, সে কলা-বতী বধূর স্থান পাইয়াছে। এমনই সুঠাম এমনই সুন্দর।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণ রাঢ়ের পশ্চিম সীমায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে যে গান গাহিয়াছিলেন, সেই গান চিরদিন বাঙ্গালা ভাষার ও সাহিত্যের মুকুটমণি হইয়া থাকিবে। সংস্কৃত মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ও বাঙ্গালা কবিকঙ্কণ চণ্ডী উভয় কাব্যেই চণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেবতা বিপন্ন হইয়া চামুণ্ডার শরণ লইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে অসুরদলনী রণসাজে সজ্জিত হইয়াছিলেন। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে অভয়া কলিকালে মর্ত্ত্যলোকে নিজের পূজা-প্রচারের অভিপ্রায়ে, কখনও কৌতুকে কখনও যুক্তিতে, সামান্য মানুষকে কষ্টে ফেলিয়া নিজের মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন।

কবিকঙ্কণও পুরাতন ঋষির ন্যায় সৃষ্টির আরম্ভ হইতে আখ্যান আরম্ভ করিয়াছেন। আদিতে একমাত্র নারায়ণ ছিলেন। তাঁহার কৃপাদৃষ্টিতে বিধাতা ত্রিভুবন নির্ম্মাণ করিলেন। বিধাতার পুত্র দক্ষ। দক্ষের কন্যা হইয়া চণ্ডী সতীরূপে আবির্ভূতা হইলেন। দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করিয়া সতী গিরিরাজমহিষী-মেনকার কন্যা হইলেন। নাম হইল গৌরী। জয়া, বিজয়া, ও পদ্মা তিন দাসী হইল। হরের সহিত গৌরীর বিবাহ হইল, প্রথমে গণেশের উৎপত্তি হইল, পরে কার্ত্তিকের জন্ম হইল। এত দিন হর হিমালয়ে ঘরজামাই ছিলেন। একদিন মেনকা কন্যাকে বলিলেন, দেখ,

প্রভাতে খাইতে চাহে কার্ত্তিক গণাই।
চারি কড়া সম্ভাবনা তোর ঘরে নাই॥
দরিদ্র তোমার পতি পরে বাঘছাল।
সবে ধন বুড়া বৃষ গলে হাড়মাল॥
দুই পুত্র তিন দাসী স্বামী শূলপাণি।
প্রেত ভূত পিশাচের লেখা নাহি জানি॥
মিছা কাজে ফিরে স্বামী নাহি চাষবাস।
অন্ন বস্ত্র কতেক যোগাব বারমাস॥
নিরন্তর আমি কত সহিব উৎপাত।
রান্ধ্যে বাড়্যে দিতে মোর কাঁখে হৈল বাত॥
দুগ্ধ উথলিলে তুমি নাহি দেও পানি।
পাশা খেলাইয়া গোঁয়াও দিবস রজনী॥

মা যেমন ঝীও তেমন। তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, কেন,

জামাতারে বাপ মোর দিল ভূমি দান।
তথি ফলে মসুর কাপাস মাষ ধান॥
রান্ধ্যে বাড়্যে দেও বলে কত দেও খোঁটা।
তব ঘরে আসিতে দুয়ারে দিও কাঁটা॥

ইহার পর হিমালয়ে আর থাকা চলে না। হরগৌরী কৈলাসে চলিয়া গেলেন। সেখানে কিন্তু সম্বল কিছুমাত্র নাই। হর ভিক্ষা করিয়া আনিলেন, গৌরী রাঁধিয়া দিলেন। এইরূপে একটী দিন গেল। পরদিন হর বিশ্রাম করিতে বসিলেন। কিন্তু বিশ্রামের সময়েও ক্ষুধা থাকে। গৌরীকে হর ঝাট স্নান করিয়া রন্ধন চড়াইতে বলিলেন, নানাবিধ ব্যঞ্জনের আদেশ করিলেন। কিন্তু রন্ধনের কথা শুনিয়া গৌরীর চক্ষু স্থির। তিনি বলিলেন,

রন্ধন করিতে ভাল বলিলা গোঁসাই।
প্রথম পাত্রে যাহা দিব তাহা ঘরে নাই॥
কালিকার ভিক্ষা নাথ উধার সুধিনু।
অবশেষে যাহা ছিল রন্ধন করিনু॥
আছিল ভিক্ষার শেষ পালি দুই ধান।
গণেশের মূষিক করিল জলপান॥
আজিকার মত যদি বান্ধা দেও শূল।
তবে সে পারিব নাথ আনিতে তণ্ডুল॥

তখন পশুপতি সক্রোধে বলিলেন, "আমি ছাড়ি ঘর, যাব দেশান্তর, কি মোর ঘর করণে।" পার্ব্বতীও খেদ করিতে লাগিলেন,

কি জানি তপের ফলে পাইয়াছি হর।
সই-সাঙ্গাতি নাহি থাকে দেখে দিগম্বর॥
উন্মত্ত ল্যাঙ্গটা হর চিতাধূলি গায়।
ছাড়িলে শিরের জটা অবনী লোটায়॥
একাসনে শুতে নারি সাপের নিশ্বাসে।
ততোধিক পোড়ে প্রাণ বাঘছালবাসে॥
বাপের সাপ পোয়ের ময়ূর সদাই করে কেলি।
গণার মূষা কাটে ঝুলি আমি খাই গালি॥

গৌরী বাপের বাড়ী যাইবার কল্পনা করিলেন। কিন্তু গৌরীকে পদ্মা সপ্তদ্বীপে যুগে যুগে তাঁহার অর্চ্চনা প্রচার করিতে বলিলেন। অর্চ্চনা পাইলে গৌরীর অন্নবস্ত্রের অভাব আর থাকিবে না।

এই উদ্দেশ্যে প্রথমে চণ্ডিকা দ্বাপর-যুগের শেষে বিশ্বকর্ম্মাকে কলিঙ্গ-রাজার দেশে এক দেউল নির্ম্মাণ করিতে বলিলেন, এবং রাজাকে স্বপ্নে বলিলেন, "করি বহু পরামর্শ আইনু ভারতবর্ষ, লইব তোমার পূজা আগে।"

সুতরাং রাজা হৈমবতীর পূজা করিলেন। পূজার পরে চণ্ডিকা ঘরে ফিরিতেছিলেন, পথে বিন্ধ্যাগিরির পশুগণ তাঁহাকে ধরিয়া বসিল, এবং বনফুল আম জাম শেহাকুল কাল-চিতাফল দিয়া পূজা করিল।

যখন ভবানী কলিঙ্গদেশে গেলেন, তখন মহেশের দিন চলা ভার হইল। তিনিও মর্ত্ত্যের পূজা-সংগ্রহে বাহির হইলেন। পরে হরপার্ব্বতী উভয়ে কৈলাসে আবার একত্র হইলেন। এবার উভয়ের মধ্যে যুক্তি হইল যে, ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বরকে অভিশাপ দিয়া মর্ত্ত্যলোকে পাঠাইতে হইবে। "তবে যে প্রচার হয় পূজার পদ্ধতি।" নারদের উপদেশে ইন্দ্র শিবপূজা আরম্ভ করিলেন। শিশুপুত্র নীলাম্বরের প্রতি নন্দনকাননে ফুল তুলিয়া আনিবার আদেশ হইল। এমন সময় নীলাম্বরের মাথার উপরে শকুনি ডাকিল, এবং সে জেঠির ডাকও শুনিতে পাইল। মাথার উপরে বাধা পড়িল, সে ফুল তুলিতে যাইতে চায় না। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং পিতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য বিষয়ে অনেক পুরাণ প্রমাণ শুনাইলেন।

নাহি নিয়োজিনু রণে, দুরন্ত অসুর সনে,
নাহি পাঠাইনু দূর দেশ ॥
সবে চারি দণ্ড যাবে, কুসুম আনিয়া দিবে,
ইথে কেন মনে ভাব ক্লেশ ॥
বিষম আরতি নয়, সবে যাবে দণ্ড ছয়,
এ নন্দন কানন ভিতরে।
নিকটে কুসুম আছে, উঠিতে না হবে গাছে,
আরাধনা করিব শঙ্করে ॥

অগত্যা নীলাম্বর 'পান লইল,' এবং হরপার্ব্বতীর যুক্তিজালে পড়িয়া ব্যাধ কালকেতুরূপে মর্ত্ত্যে চণ্ডিকার পূজা প্রচার করিল। কালকেতুকে চণ্ডিকা অনেক ধন দিলেন। সে কলিঙ্গদেশের নিকটে গুজরাট নামে

এক নগর নির্ম্মাণ করাইল, অনেক প্রজা বসাইল। বিপদের সময় চণ্ডিকা তাহার সহায় থাকিতেন; কেন না, তিনি মন্দিরে পূজা পাইতেন। কলিঙ্গদেশের রাজা কালকেতুর শত্রু হওয়াতে বিলক্ষণ শিক্ষা পাইলেন। তিনিও চণ্ডিকার ভক্ত হইলেন।

"গুজরাটে কালকেতু খ্যাত হইল রাজা।
আর যত ভূঞা রাজা করে তাঁর পূজা॥"

কিন্তু এইরূপে কতকাল চলে? নীলাম্বরের শাপের কাল ফুরাইল। সে জায়া-সঙ্গে পুষ্পক বিমানে চাপিয়া ইন্দ্রালয়ে ফিরিয়া গেল। কাজেই পার্ব্বতী আবার পদ্মাবতীর সহিত যুক্তি করিলেন। শঙ্করও অবশ্য যোগ দিলেন। এবার রত্নমালা নামে ইন্দ্রের এক নর্ত্তকী অভিশপ্ত হইল। ইচ্ছানি নগরে লক্ষপতি নামে এক ধনশালী গন্ধবণিক্ ছিল। রত্নমালা তাহার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিল। নাম হইল খুল্লনা। উজানী নগরে ধনপতি নামে এক সাধু (সওদাগর) ছিল। লহনা তাহার প্রথম বনিতা ছিল। খুল্লনা ধনপতির দ্বিতীয় বনিতা হইল।

খুল্লনা চণ্ডীর দাসী, চণ্ডীর ভক্ত। কিন্তু খুল্লনার স্বামী, ধনপতি, 'মেয়ে দেব' দেখিতে পারিত না। এমন কি, যখন ধনপতি উজানী নগরে রাজার আদেশে সাত ডিঙ্গা ভরিয়া সিংহলে বাণিজ্য করিতে যায়, খুল্লনার প্রতিষ্ঠিত চণ্ডীর ঘট পায়ে ফেলিয়া দেয়! ধনপতি কিন্তু শঙ্করের ভক্ত ছিল। সকল দিক্ ভাবিয়া হরপার্ব্বতী আবার যুক্তি করিয়া ইন্দ্রের আর এক কুমার মালাধরকে শাপ দিলেন। সে ও তাহার দুই স্ত্রী মর্ত্ত্যে মানুষ রূপে জন্মগ্রহণ করিল। মালাধর, খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্ত হইল, এবং মালাধরের দুই বনিতার এক জন সিংহল-রাজকন্যা, এবং অপর জন উজানী রাজকন্যা হইল। সিংহল যাত্রায় চণ্ডিকা শ্রীমন্তের পিতা ধনপতিকে মগরার মোহানায় নাকের জলে চোখের জলে করিলেন। একটি ডিঙ্গী লইয়া ধন-

পতি কোন-রূপে প্রাণে প্রাণে সিংহলে উপস্থিত হইলেন। সিংহলের নিকটে কালীদহে মায়া পাতিয়া চণ্ডিকা তাহাকে অপরূপ কমলে-কামিনী প্রদর্শন করান। ধনপতি কর্ণধারকে দেখাইল, কিন্তু সে দেখিতে পাইল না,—

অপরূপ হের আর, দেখ ভাই কর্ণধার,
কামিনী কমলে অবতার।
ধরি রামা বাম করে, উগরয়ে করিবরে,
পুনরপি করয়ে সংহার॥
কমল কনকরুচি, স্বাহা স্বধা কিবা শচী,
মদন সুন্দরী কলাবতী।
সরস্বতী কিবা রমা, চিত্রলেখা তিলোত্তমা,
সত্যভামা রম্ভা অরুন্ধতী॥
প্রামাণিক যোজন গভীর বহে জল।
ইথে উপজয়ে ভাই কেমনে কমল॥
কমলিনী নাহি সহে তরঙ্গের ভর।
তরঙ্গহিল্লোলে রামা করে থর থর॥
নিবসে রমণী তাহে ধরিয়া কুঞ্জর।
হরি হরি নলিনী কেমনে সহে ভর॥
হেলায় কামিনী উগরয়ে যূথনাথে।
পলাইতে চাহে গজ ধরে বাম হাতে॥
পুনরপি তায় রামা করয়ে গরাস।
দেখিয়া আমার হৃদে লাগয়ে তরাস॥

সিংহলের রাজার নিকটে এমন অসম্ভব কথা বলিয়া ধনপতি কারাগারে রুদ্ধ হইলেন। পরে শ্রীমন্ত চণ্ডিকার কৃপায় নানা বিঘ্ন বিপত্তি হইতে উদ্ধার

পাইয়া সিংহলের রাজাকে কমলে-কামিনী দেখায়, এবং রাজকন্যা বিবাহ করিয়া পিতাকে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হয়। এখানেও সেই বিপত্তি। উজানী নগরের রাজা কমলে কামিনীর অসম্ভব কথায় শ্রীমন্তকে মশানে বধের আজ্ঞা দিলেন। চণ্ডিকা এখানেও রাজার সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিলেন, এবং পরে নদ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে কমলে-কামিনী রূপে উজানীর রাজাকে দর্শন দিলেন। ফলে সিংহলে ও উজানী নগরে চণ্ডিকার পূজা প্রচারিত হইল।

এইরূপে ষোল পালা গান হইয়াছে। এই গানের নায়ক নায়িকা কে? —হরগৌরী। উপনায়ক উপনায়িকা অনেক আছে। যাঁহারা প্রধান, তাঁহারা ইন্দ্রের কুমার, ইন্দ্রের পুত্রবধূ, ইন্দ্রের নর্ত্তকী। সংসারে যদি কোনও ব্যক্তি প্রধান হন, গ্রাম্য লোকের বিশ্বাস, তিনিই শাপভ্রষ্ট কোনও দেবতা। হরপার্ব্বতীর মানবভাব যেমন আছে, তেমনই তাঁহাদিগের দেবভাবও আছে।

এই ভাব ধরিয়া কবিকঙ্কণ আমাদিগকে কাব্য-শাস্ত্রের সারভূত নবরস পূর্ণমাত্রায় ঢালিয়া দিয়াছেন। তাঁহার কবিত্বপটুত্ব, তাঁহার শব্দ-যোজনা, তাঁহার মানব-চরিত্র-জ্ঞান, সংসারে সহস্র খুঁটিনাটির জ্ঞান চণ্ডী-গ্রন্থের প্রতি কাব্যরসগ্রাহীর চিত্ত চিরকাল আকর্ষণ করিবে।

মুকুন্দরাম দরিদ্র গ্রাম্য কবি। তাঁহার শ্রোতা তাঁহারই মত গ্রাম্য। তাহাদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা তিনি যেমন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন, কোন নাগরিক কবি সুখ-শান্তির শীতল ছায়ায় কদাপি তেমন অনুভব করিতে পারিতেন না। এই জন্যই ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ছাড়িয়া তাহারা কবিকঙ্কণ চণ্ডীর আদর করে। বনসন্নিহিত গ্রামে বসিয়া গ্রাম্য কবি গ্রাম্য চিত্র ব্যতীত অন্য চিত্র লিখিতে পারিতেন না। তিনি মানবচিত্তের ভাবলহরীর অবিকল চিত্র লিখিয়াছেন। তাহাতে কাব্যালঙ্কার প্রচুর আছে, কিন্তু অতিশয়োক্তি নাই। ছন্দের মাধুর্য্য আছে, কিন্তু শব্দের

আড়ম্বর নাই। ভাষায় তাঁহার কি অতুলনীয় অধিকার ছিল! গর্ভবতী নারী কি ব্যঞ্জনের সাধ করে, অন্নকষ্টকাতর ব্যক্তির ভোগলালসার সীমা কি,—ইহা তিনি যেমন জানিতেন, তেমনই সন্তানপ্রসবের পর কি কি কার্য্য করিতে হয়, বিবাহের সময় কি কি বিধি পালন আবশ্যক, তাহাও তিনি তেমনই জানিতেন! বন্য জন্তু পক্ষী সর্পের নাম চান, কবিকঙ্কণকে জিজ্ঞাসা করুন। ফুলের নাম, আরণ্য বৃক্ষের নাম, অষ্ট অলঙ্কার, 'ব্যাল্লিশ বাজনা', যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্র জানিতে চান, কবিকঙ্কণ চক্রবর্ত্তীকে ধরুন। অভাগী নারী পতিসোহাগ-কামনায় কি ঔষধ প্রয়োগ করিবে, কি গাছের গন্ধে সর্প পলায়ন করে, হাটে কি দ্রব্যের কি দর, কি দ্রব্যসংযোগে কি ব্যঞ্জন রাঁধিতে হয়, পাড়া-গাঁয়ে মালা লইয়া কেমন দলাদলি হয়, ভিন্ন ভিন্ন জাতির ব্যবসায় কি, জাতি চরিত্রই বা কি, ইত্যাদি এমন কোন গ্রাম্য ব্যাপার নাই, যাহা চক্রবর্ত্তী মুকুন্দরাম জানিতেন না, এবং সুযোগমত আমাদিগকে বলেন নাই। গ্রাম্য শ্রোতা এই সকল কথা যেমন বুঝে, তেমন কি প্রকৃতির শোভা কি দ্রব্য-বিশেষ দেখিয়া কবির কবিত্বোচ্ছ্বাস বুঝিতে সমর্থ?

এ কথা সত্য যে, কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে অনেক সংস্কৃত শব্দ আছে; কিন্তু ইহাও সত্য, সে সকল শব্দ সত্ত্বেও রসভঙ্গ হয় নাই। আমাদের বোধ হয়, ইচ্ছা করিয়াই এবং কবিত্বের গাম্ভীর্য্য বাড়াইতে গিয়াই মুকুন্দরাম স্থানে স্থানে সংস্কৃত শব্দ পুঞ্জীভূত করিয়াছেন। গ্রাম্য শ্রোতা সকল শব্দ নাই বুঝুক, কিন্তু শব্দের ঝঙ্কার অনুভব করিতে পারে। স্বর্ণগোধিকারূপিণী অভয়ার নিজমূর্ত্তি-ধারণ পড়ুন,—

হুঙ্কারে ছিঁড়িয়া দড়ী, পরিয়া পাটের শাড়ী,
যোড়শ বৎসরের হৈলা রামা।
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি, অকলঙ্ক শশীমুখী,
কিবা দিব রূপের উপমা॥

সুচারু নিতম্ব সাজে, চরণে পঙ্কজ রাজে,
মণিময় কাঞ্চন নূপুর।
বিমল অঙ্গের আভা, নানা অলঙ্কার শোভা,
রবির কিরণ করে দূর॥
ত্রিবলি বলিত মাঝে, সুবর্ণ কিঙ্কিণী সাজে,
উরুযুগ রম্ভার সমান।

** ** **

সর্ব্বাঙ্গে চন্দন পঙ্ক, অনঙ্গ বলয় শঙ্খ,
বাহু বিভুষণ সুশোভন।
সকল অঙ্গুলি ভরি, মাণিক্য অঙ্গুরী পরি,
দন্তরুচি ভুবনমোহন॥
মুখচন্দ্র অনুপাম, বিন্দু বিন্দু শোভে ঘাম,
সিন্দূর-তিলক তিমিরারি।
অধরে বিদ্যুৎদ্যুতি, তাম্বুলের রাগ তথি,
নাসাগ্রে মাণিক মনোহারী॥

কবিকঙ্কণের বিশেষত্ব অনেকে অনেক স্থলে দেখাইয়াছেন। একটির উল্লেখ এখানে করা যাইতেছে। তিনি তাঁহার কাব্যে একই প্রকার ব্যাপার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। দারিদ্র্যের কথা, ঘরোয়া কন্দলের কথা, ভোজনের কথা, গর্ভবতীর সাধ খাওয়ার কথা, বিবাহের কথা, যুদ্ধের কথা, সিংহল-যাত্রার-কথা একাধিকবার বর্ণনা করিয়াছেন। আরও দেখা যায়, একই বিষয়ের বর্ণনায় ভাষাও প্রায় একরূপ, এমন কি কোনও কোনও স্থলে একই পদ্য বাহির হইয়াছে। হঠাৎ পড়িবার সময় পুনরুক্তিদোষ মনে পড়ে। মনে হয়, কবিকঙ্কণের বৈচিত্র্যজ্ঞান ছিল না, হয় ত কবিতা-রচনা তাঁহার সহজ ছিল না। কিন্তু যখন মনে করি, তাঁহার "অভয়া-মঙ্গল" ষোল পালায় গাহিবার গান, যখন মনে করি, বর্দ্ধমান জেলার

প্রসিদ্ধ চণ্ডী-গায়ক জগাই সেকরা একই ভাবের গান, একই কবিতা আবৃত্তি দ্বারা কত দিন ধরিয়া শ্রোতাদিগকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিত, তখন কবিকঙ্কণের উদ্দেশ্য সম্যক্ বুঝিতে পারি, এবং ভাবি যে, পুনরুক্তি দোষের না হইয়া গুণের কারণ হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, কবিকঙ্কণ গান গাহিয়াছেন, আধুনিক কাব্য লেখেন নাই। শ্রোতা উন্মুখ হইয়া থাকে, কি আঁসিতেছে, তাহা সে পূর্ব্ব হইতেই কিছু কিছু বুঝিতে পারে, এবং কিঞ্চিৎ রূপান্তরিতভাবে কবিতা শুনিয়া তাহার পূর্ণরস গ্রহণ করে। প্রচলিত চণ্ডীর গান নিরবচ্ছিন্ন গান নহে। কোন্ গান কিংবা যাত্রা নিরবচ্ছিন্ন গান? গানের মধ্যে মধ্যে কথা আছে, কবিতা-আবৃত্তি আছে। যমজ পুত্র দুই পার্শ্বে লইয়া যখন জগাই সেকরা কবিতা কেবল আবৃত্তি করিয়া যাইত, তখন তালে তালে আবৃত্তির ঠমক, বোধ হয়, তাহার গানকেও পরাজিত করিত। বোধ হয়, গোবিন্দ অধিকারীর গান অপেক্ষা তাহার কথায় শ্রোতার মন অধিক আকৃষ্ট হইত। কথার এক ইঙ্গিতে বহু কাব্য লুক্কায়িত থাকিত। এইখানেই কবির গুণপনা। সে গুণপনা কবিকঙ্কণ প্রচুর দেখাইয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার চণ্ডী কাব্যালঙ্কারিকের নিকট বাঙ্গালা ছন্দের দৃষ্টান্তের আকর, ভাষাশিক্ষার্থীর নিকট শব্দকোশ, ইতিহাসরসিকের নিকট রাঢ়ের প্রাচীন সামাজিক ইতিহাস।

কত প্রচলিত বাক্যে কবিকঙ্কণকে দেখিতে পাই, তাহার ইয়ত্তা হয় না। 'নিশিতে জাগিয়া থাক, প্রহরে প্রহরে ডাক, হবে তুমি শিয়াল প্রহরী।' 'এ বিরহ জ্বরে, পতি যদি মরে, কোন ঘাটে খাবে পাণি।' 'পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।' 'মাণিক্য অঙ্গুরী সপ্ত নৃপতির ধন।' 'আমার নগরে বৈস, যত ভূমি চাহ চস, তিন সন বই দিও কর।' 'দুই চক্ষু জিনি নাটা' 'কুমারের চাক যেন ফিরে।' 'এক তিল যথা যাই, জুড়াইতে নাহি ঠাঁই।' 'কি জানি দৈবের মায়া, আসি কোন পথ দিয়া, নারিকেলে সান্ধাইল পাণি।'

'অলকা তিলকা পর মোহন কাজল।' 'আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মুণ্ডে।' 'আপনি রাখিলে রহে মান।' 'দেখয়ে সরিষা ফুল।' 'নদী নালা একাকার।' 'বসে খেতে নাহি আঁটে।' ইত্যাদির অংশবিশেষ প্রায় কবির ভাষায় গ্রাম্য লোকে অদ্যাপি বলিয়া থাকে।

কবিকঙ্কণ তিন শত বৎসর পূর্ব্বের যে সামাজিক চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিকের নিকট চিরদিন অমূল্য বিবেচিত হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি কবিকঙ্কণ গ্রাম্য দুঃখী কবি, তাঁহার শ্রোতা তাঁহারই তুল্য গ্রাম্য লোক। দেখা যায়, এখন যেমন, তখনও গর্ভিণী নারীর সন্তানপ্রসবে বিলম্ব হইলে তাহাকে জল-পড়া (মন্ত্রপূত জল) খাওয়ান হইত। প্রসবের পর আঁতুড়ঘরের দ্বারে গরুর মাথার ষষ্ঠী রাখা হইত, এবং তিন দিনে, ছয় দিনে, আট দিনে, নয় দিনে, ও একত্রিশ দিনে এক এক উৎসব হইত। এখন অনেক স্থানে একত্রিশ দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া একুশ দিনেই প্রসূতি আঁতুড়ঘর হইতে বাহির হইয়া থাকে। শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে পুত্রের ছয় মাসে, এবং কন্যার সাত মাসে অন্নপ্রাশন হইত। পাঁচ বৎসর বয়সে গন্ধবণিকের পুত্রেরও কর্ণবেধ হইয়া বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত গুরু মহাশয়ের হাতে অর্পিত হইত। সাত বৎসর বয়সে কন্যারও কর্ণবেধ হইত, কিন্তু সকলে বিদ্যা শিক্ষা করিত না। শ্রীমন্তের মা খুল্লনা পত্র পড়িতে পারিত, কিন্তু তাহার সৎ-মা পারিত না। অথচ দুই জনেই এক বাড়ীর মেয়ে ছিল।

বাল্যবিবাহ ও পুরুষের বহুবিবাহ বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। এগার বার বৎসর বয়সে কন্যার বিবাহ হইত। বর গলায় রত্নমালা ও হাতে সোনার তাড়বালা পরিয়া, গায়ে কুঙ্কুম লেপিয়া, পাটের (পট্টবস্ত্রের) দোলায় চড়িয়া গোধূলি সময়ে বিবাহ করিতে যাইত। সঙ্গে নানাবিধ বাজনা ও দলে দলে বরাতি (বরযাত্রী) চলিত। বিবাহের পর বর-কন্যা অরুন্ধতী দেখিত। এই রীতি বাঙ্গালা দেশ হইতে এখন উঠিয়া গিয়াছে। প্রাচীনকালে

ছিল, এখনও ওড়িষ্যার ব্রাহ্মণেরা বিবাহান্তে রাত্রিকালে অরুন্ধতী দেখেন। দম্পতী বশিষ্ঠ-অরুন্ধতীর ন্যায় অবিচ্ছেদে চিরদিন ঘর করিবে, অরুন্ধতী দেখার এই অর্থ ছিল। কন্যার শুভ কামনা করিয়া তাহার মা, বিবাহের পূর্ব্বে বাড়ী বাড়ী ঔষধ করিয়া ফিরিত। সতীনের কুহক হইতে কন্যাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশে এইরূপ ঔষধের প্রয়োজন হইত। বিবাহের পর শয্যা তোলার কড়ি দিতে হইত।

কন্যা অল্প বয়সেই স্বামীর ঘর করিতে যাইত। স্বামী বশীভূত করিতে বয়োজ্যেষ্ঠা সতা 'কাঙর-কামিক্ষার' তন্ত্র-মন্ত্র ও নানাবিধ ঔষধ করিত। অথর্ব্ব-বেদ হইতে তন্ত্র-মন্ত্র এ দেশে প্রচলিত আছে। বোধ হয়, মহাভারতের সত্যভামাকেও ঔষধ খুঁজিতে হইয়াছিল। স্বামীকে 'ওষুধ' করা যে এখনও উঠিয়া গিয়াছে, এমন নয়। সতীনের কন্দল এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। পাটের শাড়ী ও সোনার চুড়ী দিয়া স্বামীকে কন্দল মিটাইতে হইত। বোধ হয়, ব্রাহ্মণের ঘরেই বহু স্ত্রী থাকিত, এবং অন্য জাতির মধ্যে প্রথমা পত্নী বাঁঝা, এবং স্বামী ধনবান্ হইলে ঘরে দুই স্ত্রী বিরাজ করিত। 'এক জন সহিলে কন্দল হয় দূর। বিশেষিয়া জানেন চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ॥'—ইহাতে বোধ হয় মুকুন্দরামেরও দুই স্ত্রী ছিল, কিংবা তাঁহার যে এক স্ত্রী ছিল, তিনি তাদৃশ মধুর-ভাষিণী ছিলেন না।

সুখের বিষয়, সতীর সহমরণ উঠিয়া গিয়াছে। 'সিন্দুর তিলক ভালে, চিরণী কুন্তলে দোলে, সঘনে নাড়য়ে আম্রডাল। সঘনে হুলুই পড়ে, ছায়া চতুর্দ্দোলে চড়ে, ইন্দ্রের হৃদয়ে বাজে শাল ॥' ইন্দ্রের পুত্রবধূ ছায়া স্বামীর সহমৃতা হইয়াছিলেন। বোধ হয়, আর কিছু কাল পরে, এই সহমরণ-বর্ণনা বঙ্গীয় পাঠক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না।

ধনপতি সাধু পিতৃশ্রাদ্ধ করিবে। ভাট নানা স্থানে পত্র লইয়া গেল।

'বুলন কাণ্ডার' ঘরে ঘরে গুয়া ও সন্দেশ দিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার নানা স্থানের যোল শত বেণে ধনপতির বাড়ী আসিল। কেহ দোলায়, কেহ ঘোড়ায়, কেহ হাতীতে, কেহ বাঁকে, কেহ নৌকায় চাপিয়া আসিল। কেহ কেহ এমন ধনী ছিল যে, তাহাদের রথ সাত ঘোড়ায় দিন রাত বহিত; কাহারও বাহির মহলে সাত মরাই টাকা থাকিত। কিন্তু 'ধন হইতে হয় কি বা কুলের প্রকাশ।' ধনপতি আগে কার কপালে চন্দন ও গলায় মালা দিবে, তাহা লইয়া তুমুল বিবাদ আরম্ভ ও ঘরের কুৎসা বাহির হইল। কারও ঘরে ছয় বউ পতির সহমৃতা হয় নাই, কারও বাপ হাটে আমলা (আমলকি) বেচিত, এবং স্নান না করিয়া খাইতে বসিত। শেষে ধনপতির নিজের ঘরের কথা বাহির হইল। যখন সে রাজার কাজে বিদেশে ছিল, তখন তাহার বড় স্ত্রী কন্দল করিয়া মারিয়া ধরিয়া ছোট খুল্লনাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। শুধু ইহাই নহে, অভাগী খুল্লনাকে বনে বনে ছাগল চরাইতে হইয়াছিল। তখন তার বয়স সবে বার তের বৎসর। কিন্তু বনে শতেক মাতাল বেড়ায়; কে জানে খুল্লনার সতীত্ব ছিল কি না। সে সতীত্বের পরীক্ষা না দিলে কেহই তার রান্না খাইবে না। ধনপতি বিষম ফাঁপরে পড়িল; তাহার শ্বশুর রাজার দোহাই দিল। কিন্তু জ্ঞাতিকে রাজবল দেখান মিছা। রাজা ধন ও প্রাণ লইতে পারেন, কিন্তু 'জ্ঞাতি বন্ধুজন' * জাতি লইতে পারে। ধনপতি লক্ষ তঙ্কা দিয়া বান্ধব বশ করিতে ইচ্ছা করিল। খুল্লনা বুদ্ধিমতী। সে বলিল,

---

* এখন বাঙ্গালায় জ্ঞাতি কুটুম্ব। কবিকঙ্কণে বন্ধু শব্দ সংস্কৃত অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সংস্কৃত কুটুম্ব অর্থে পরিবারবর্গ, এবং বন্ধু অর্থে আত্মবন্ধু, পিতৃবন্ধু ও মাতৃবন্ধু। অর্থাৎ, বাঙ্গালা কুটুম্ববর্গ বুঝায়। ওড়িয়া কুটুম্ব=বাঙ্গালা পরিজন ও জ্ঞাতি। ওড়িয়া বন্ধু=বাঙ্গালা কুটুম্ব।

'আজি ধন দিলে দিবা বৎসরে বৎসরে' ; অথচ তাহার কলঙ্ক ঘুচিবে না। সে পরীক্ষা 'লইবে'। গঙ্গাজলে স্নান করিয়া সে সর্ব্বমঙ্গলার পূজা করিল। অভয়া অভয় দিলেন। সভায় শত পণ্ডিত একবুদ্ধি হইয়া পরীক্ষার বিধি স্থির করিলেন। অশ্বথপত্রে মন্ত্র লিখিয়া দুই পথিকের মাথায় দিয়া সরোবরের জলে ডুবান হইল। পথিকদ্বয় পাতা লইয়া উঠিল, খুল্লনার জয় হইল।

কিন্তু জলের পরীক্ষা কিছু নয়। হয় ত পথিক দুজনের সঙ্গে ধনপতির 'সাঁট' ছিল। মাল ডাকা হইল, এক নূতন ঘটের ভিতরে বিষধর সাপ ও সোনার অঙ্গুরী রাখা হইল। খুল্লনা সেই ঘটের ভিতরে হাত দিয়া সাতবার অঙ্গুরী তুলিল।

এই পরীক্ষাও কিছু নয়। সাপের মুখ বাঁধা যায়। তখন কামার আগুনে শাবল তাতাইয়া লাল করিল। অশ্বথপত্রে বীজমন্ত্র লিখিয়া খুল্লনার হাতে দিয়া সেই জবাবর্ণ শাবল রাখা হইল। খুল্লনা শাবল ধরিয়া দূরে তৃণের উপরে ফেলিয়া দিল। তৃণ পুড়িয়া গেল।

তথাপি বিপক্ষ দলের মন উঠিল না। কে না জানে, 'আগুন ভারিলে হয় জল'। আগুনে ঘি গরম করা হইল। খুল্লনা সেই আগুন-সমান ঘি-এ সোনা ফেলিয়া হাত ডুবাইয়া তুলিয়া লইল। কিন্তু সে আগুনও ত ভারা যায়। যাহা হউক, এত দ্বন্দ্বে কাজ নাই, এক লক্ষ তঙ্কা দিলেই সকল পাপ ঘুচিয়া যায়। তখন ধনপতি রোষযুক্ত হইয়া তুলা পরীক্ষা করাইলেন। ইহাতেও বণিক্‌গুলা হারিল, কিন্তু তাহাদের কানাকানি থামিল না। তখন ধনপতির এক পিসাত ভাই সীতার জৌগৃহপরীক্ষার কথা তুলিল। সে উচিত কথা কহিতে চায়, 'ভাইবউ' জৌগৃহ করুন, সকলের মনে সন্তোষ হউক।

নগরে নগরে লোক ছুটিল। বাঁশের মাথায় পাটের পাছড়ায় শত পল

সোনার চেঙ্গড়া (চাপ) বাঁধিয়া নগরে নগরে ফিরান হইল। যে জৌঘর নির্ম্মাণ করিবে, সে সেই সোনা পাইবে। কিন্তু সব কারিগর মাথা হেট করিল। দেবতার পরীক্ষা দেবতাই জানেন, তাহারা জৌগৃহের কথা কানেও শুনে নাই। এমন সময়ে চণ্ডী আকাশ-বিমানে যাইতেছিলেন, তিনি তাঁহার দাসী খুল্লনাকে লোক-গঞ্জনা হইতে উদ্ধার করিবার মানসে বিশ্বকর্ম্মাকে জৌঘর নির্ম্মাণ করিতে বলিলেন। বিশাই ও তাহার ছেলে হনুমান্ মানুষের আকারে আসিয়া ধনপতির চেঙ্গড়া ধরিলেন। জৌর (জতুর) প্রকাণ্ড ঘর নির্ম্মিত হইল। খুল্লনা অভয় পদ ধ্যান করিয়া সেই ঘরে ঢুকিলে তাহাতে আগুন লাগান হইল। প্রথমে নীল ধূঁআ আকাশে উঠিল ; উত্তর পবন আসিয়া জুটিল, যোজন প্রমাণ আগুন উঠিল, আগুনের 'দফালে' ষাঁড়ের গর্জ্জন শোনা গেল, গগনবাসী মেঘের আড়ে লুকাইল। কিন্তু সতীর অঙ্গে আগুন মৃণালশীতল, তুষার-শীতল হিম বোধ হইল।

কলিযুগে এমন কর্ম্ম কেহ করে নাই, কেহ দেখে নাই, কেহ শোনে নাই। খুল্লনা জ্বলন্ত আগুন হইতে বাহির হইল, বণিক্‌সমাজ সতীর শাপের ভয়ে তাহার পায়ে পড়িল। কেহ বলিল, আমি তোর ভাই ; কেহ বলিল, মান চাই না, ছুটি অন্ন দাও, খেয়ে ঘরে যাই ; কেহ বলিল, তুমি মানুষ নও, তা আমি জানি, কিন্তু বলি কারে। খুল্লনা রাঁধিবার আজ্ঞা পাইল, জ্ঞাতি-গোত্র কুটুম্বেরা ভোজন করিল। তার পর কেহ দোলা, কেহ ঝারি, কেহ কণ্ঠমালা, কেহ পাটের পাছড়া, কেহ ঘোড়া লইয়া ফিরিয়া গেল।

আ'জ কা'ল জীবন-সংগ্রাম বাড়িয়াছে ; বারবেলা কালবেলা না মানিয়া লোকে রেল ইষ্টীমারে দুর দেশান্তরে যাত্রা করিতেছে। অগত্যা লোকের যাত্রিক জ্ঞান ক্ষীণ হইতেছে। সেকালে পথে গোসাপ, কচ্ছপ, গণ্ডার, শজারু, শশক দেখিলে লোকের যাত্রা ভঙ্গ হইত। মাথার উপরে ডোম-চিল ফিরিলে, পথে কাঠের বোঝা দেখিলে, টিকটিকির ডাক শুনিলে, পায়ে হুচোট

খাইলে, কাপড়ে শেয়াকুল কাঁটা বিঁধিলে, শুখ্‌না ডালে কাক কু কু শব্দ করিলে, যোগিনী আধখানি লাউ ভিক্ষা করিলে, তেলী তেল লবে, তেল লবে, করিয়া বেড়াইলে, বামে সাপ, দক্ষিণে শিয়ালী বেড়াইলে, অমঙ্গলের আশঙ্কা হইত। এখনও যে হয় না, তা নহে। এখনও দৈবজ্ঞ পাঁজী খুলিয়া ও রাশিচক্র পাতিয়া যাত্রার শুভাশুভ গণনা করে। তখনও তাহারা শতানন্দের ভাস্বতী ও শ্রীনিবাসের দীপিকা দেখিয়া বালকের জন্মপাতি লিখিত। বোধ হয় কবিকঙ্কণের সময়ে রাঢ়ে রঘুনন্দনের প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

সে কালের বসন ভূষণ এ কালে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কবিকঙ্কণ যত প্রকার নারী-ভূষণের নাম করিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশ আ'জ কা'ল আর নাই। পুরুষের হাতে তাড়বালা, কানে বউলী বঙ্গদেশে আর নাই। বস্ত্রের ত কথাই নাই। ধুতী তখনও কেবল পুরুষের বসন হয় নাই। পার্ব্বতী ও রম্ভাবতী বিবাহের সময় হরিদ্রাযুত ধুতী পরিয়াছিলেন। ধুতী মহার্ঘ ছিল। কোটালেরা লোকের নিকট উৎকোচস্বরূপ ধুতী লইত। দরিদ্রেরা খাদী (ছোট ধুতী), এবং ছোট খুঞা (তিসীর আঁশের কাপড়,) ছেঁড়া কানি, মুড়া কাপড় (পাড়হীন খাদি), ও ধোকড়ী (মোটা কাপড়) পরিত। শীতকালে দোপাট্টা ও পাছুড়ী গায়ে দিত। খুঞা পরিলে গা ঢাকা পড়িত না। এই হেতু দরিদ্র স্ত্রীলোকে ওড়না স্বরূপে খোসলা (কোনও গাছের ছালের মোটা কাপড়) গায়ে দিত। ধনবান্ লোকের জোড় (ধুতী চাদর) কাপাস ও পাটের লম্বা মোটা গড়া ছিল। শীতকালে তসর ও 'বিচিত্র পামরী' (শাল) বস্ত্র ও শালের জোড়া ছিল। রমণীরা তসরের ও পাটের, শাদা ও নেতের শাড়ী পরিত। আ'জ-কা'ল হাওয়া শাড়ী হইয়াছে; পূর্ব্বকালে পাটের নেত ছিল। এ জন্য তাহারা দোছটী করিয়া শাড়ী পরিত, এবং নানা চিত্র-বিচিত্র বিনোদ কাঁচলী গায়ে দিত। তাহারা মেঘডম্বর (নীলাম্বরী) কাপড়ে প্রীত হইত।

ধনবানেরা বাড়ীতেও জুতা পরিত, এবং পাটের দোলায় চড়িয়া এখানে ওখানে যাইত।

রাজাদের গড় ও গড়ের চৌদিকে বেউড় বাঁশের (ছোট ঘন কাঁটা বাঁশ) বন থাকিত। পুরীর চারি দিকে উঁচা পাঁচিল, পাঁচিলে খড়ের ছাউনি থাকিত। 'সাতানই বন্দে' নানাবিধ আবশ্যক ঘর নির্ম্মিত হইত। অন্তঃপুরে সরোবর, সপ্তম মহলে দেবদেবীর মন্দির, পাষাণের নাছ-বাট, পাষাণের চতুঃশালা, পাকশালা। উত্তরে খিড়কী, পূর্ব্বে সিংহদ্বার। আওয়াসের পূর্ব্বদিকে বিষ্ণুর দেউল, বামভাগে দুর্গামেলা, এবং সিংহদ্বারের পূর্ব্বে জলাশয়। 'নগর-চাতর' মাঝে শিবের মন্দির, অনাথমণ্ডপ ও অন্নশালা। বাসাড়্যে জনের নিমিত্ত দীর্ঘ মন্দির। এখানে প্রবাসী লোকেরা থাকিত। রাজা নগর বসাইবার নিমিত্ত বাছিয়া বাছিয়া প্রজাদিগকে ভূমি ইনাম দিতেন। নানা জাতি নগরে বাস করিয়া স্ব স্ব ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিত। অন্য দেশ হইতে চন্দন, শঙ্খ, লবঙ্গ, সৈন্ধব লবণ, নীলা, মাণিক, মতি, পলা, চামর, পামরী প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্য আনা হইত। রাজার সদাগর থাকিত। তাহারা দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে সিংহল ও অন্যান্য দেশজাত দ্রব্য আনিত।

রাজাকে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হইত। রাজপুত, মল্ল, ও বাগ্দী, ইহারাই সৈন্য হইত। স্থানবিশেষে মুসলমান সৈন্যও থাকিত। পায়ে দাঁড়াইয়া, এবং ঘোড়া, হাতী ও রথ চালাইয়া চতুরঙ্গ দলে সৈন্যেরা যুদ্ধ করিত। সঙ্গে সঙ্গে 'ব্যাল্লিশ বাজনা' বাজিত। হাতীর পিঠে শূল-শক্তি-জাঠ লইয়া মাহুত যুদ্ধ করিত, হাতীর শুঁড়ে লোহার মুগুর বাঁধিয়া দেওয়া হইত। গাড়ীতে কামান যাইত। সৈন্যের হাতে তীর ধনুক, খাঁড়া ঢাল, ভিন্দিপাল, ভূষণ্ডি, গদা, তাক, বেলক (বন্দুক) থাকিত। এই সকল অস্ত্র শস্ত্র দেশেই নির্ম্মিত হইত।

ধনী লোকেরা পাঠশালায় বন্ধুদিগের সহিত পাশা খেলিত। স্বামী স্ত্রীতেও পাশা খেলিতে ভালবাসিত। মাতাল ছিল, কিন্তু তাহারা নগরের প্রান্তে বাস করিত। সমস্ত কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে কেবল যোগেশ্বর মহেশকে সিদ্ধি খাইতে দেখি। গুলী, গাঁজা, আফিম-খোরের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। এমন কি, তামাক নাই। পান খাওয়া, পান দেওয়া অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। কাহাকেও সম্মান করিতে হইলে পাদ্য অর্ঘ্য পান, এবং কাহাকেও কোনও কাজের ভার দিতে হইলে তাহাকে পান দিয়া 'আরতি' করা হইত।

ধনপতি কুটুম্ব-বন্ধুজনকে খাওয়াইতে ইচ্ছা করিয়া বাড়ীর চেড়ী দুর্ব্বলাকে পঞ্চাশ কাহন কড়ি দিয়া হাটে পাঠাইল। আর বলিয়া দিল যে, সে কড়িতে না আঁটিলে অমুক বেণের কাছে দুই চারি টাকা লইবে। দুর্ব্বলা তসরের শাড়ী পরিয়া কপালে চন্দন চুয়ার ফোঁটা করিয়া হাতে পান গুয়া লইয়া হাটে গেল। সঙ্গে দশ জন ভারী গেল। ঐ কড়িতে দুর্ব্বলা শাক-পাতা, মাছ, শশক, কচ্ছপ, খাসী, দুধ, দই, ক্ষীর, নারিকেল, কলা, নবাত চিনি, খাঁড় গুড়, আটা, হাঁড়ী প্রভৃতি রন্ধনের যাবতীয় উপকরণ কিনিয়া আনিল। একটা খাসীর দাম আট কাহন, জীয়ন্ত শশকের দাম আট পণ, এক পণ পানের দাম এক পণ, এক সের তেলের দাম দশ বুড়ী, ভারীর বেতন জন প্রতি এক পণ। সেকালে গোল আলু ছিল না, মরিচের নাম লঙ্কা হয় নাই। হাটে দাস-দাসীও কিনিতে পাওয়া যাইত। রাজার কর্ম্মচারী, বিশেষতঃ মণ্ডল হাটে তোলা তুলিত। কোটালের ও মোড়লের দু' পয়সা উপরি-পাওনা ছিল। তাই সেয়ানা লোকে মোড়লীর নিমিত্ত রাজার নিকট প্রার্থনা করিত।

শ্রীমন্ত সিংহলে উপস্থিত হইয়া নানাবিধ বাজনা বাজাইয়া নগরে প্রবেশ করিল। দামামার ধ্বনি শুনিয়া পঞ্চপাত্রসহ সিংহল-রাজ চমকিত

হইলেন। তখন "কোটাল কোটাল ডাক পড়ে ঘন ঘন। আসিয়া কোটাল নৃপে দিল দরশন॥ লুটে দেশ খাস্ বেটা দেশের বিধাতা। ভাল মন্দ নাহি দেহ দেশের বারতা।" তিরস্কৃত কোটাল বাজনা বাজাইবার নিমিত্ত শ্রীমন্তকে প্রথমে ধমকাইল। তার পর উভয়ের ভাব হইল। কোটাল বলিল, 'মোর শিরে দায় যদি হয় ডাকাচুরী। পঞ্চাশ কাহন চাই আমার দিগারী॥" শ্রীমন্ত ঐ কড়ি দিতে স্বীকার করিলে কোটাল প্রীতমনে রাজাকে সংবাদ জানাইল।

সেকালেঁ ময়রা চিনি, নবাত, লাড়ু ও সন্দেশ করিত। লুচী কচুরী ছিল না। দুর্ব্বলা হাটে রন্ধন-সাজ কিনিয়া স্নান করিল। তার পর দই, গুড়, কলা ভক্ষণ করিল এবং ভারীদিগকে চিড়া দই কিনিয়া দিল। প্রবাসের পথে রাঁধিবার অসুবিধা হইলে ধনবান্ পথিক ক্ষীর, গুড়, দই, কলা ভোজন করিয়া থাকিতেন।

সেকালে দরিদ্রনারীর সম্বল ছিল, মেটে পাথর ও বাসি পান্তা। তাহারা অন্যের ধান ভানিত, হাটে নিজের চরকা-কাটা সূতা বেচিত। ছেঁড়া কানি বা মুড়া বা খুঞা পরিত, কুঁড়েতে থাকিত।

মুকুন্দরাম নিজে ভুক্তভোগী ছিলেন। ধনীর ভোজনেও তিনি পাঁকাল মাছ দিয়া তেঁতুলের অম্বল ভুলিতে পারেন নাই। পাঠশালায় পাশা খেলিয়া কাল কাটাইতে পারিলে সুখী মনে করিতেন। তাঁহার আদর্শ রাজ্য নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। রাজা বলিতেছেন,—

শুন ভাই বুলান মণ্ডল।
আইস আমার পুর, সন্তাপ করিব দূর,
কানে দিব সোনার কুণ্ডল॥
আমার নগরে বৈস, যত ভূমি চাহ চস,
তিন সন বই দিও কর।

হাল পিছে এক তঙ্কা, না কর কাহার শঙ্কা,
পাটায় নিশানি মোর ধর ॥
মোর গ্রামে কর বাড়ি, রয়ে বস্তে দিও কড়ি,
ডিহিদার না করিব দেশে।
সেলামি কি বাঁশগাড়ি, নানা বাবে যত কড়ি,
না লইব গুজরাট বাসে ॥
পার্ব্বণী পঞ্চক জাত, গুয়া লোণ সোমা ভাত
ধানকাটি কমির কস্তুরে।
যত বেচ চালু ধান, তার না লইব দান,
অঙ্ক নাহি বাড়াইব পুরে ॥
যত বৈসে দ্বিজবর, কার না লইব কর,
চাষী জনে বাড়ি দিব ধান।
হইয়া ব্রাহ্মণদাস, পূরাব সবার আশ,
প্রতিজনে সাধিব সম্মান ॥

মুকুন্দরামের নিজের অবস্থা স্মরণ করিলে তাঁহার বর্ণিত আদর্শ রাজ্যে প্রজার সুখ সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। তাঁহার ছয় সাত পুরুষ বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণে দামুন্যা গ্রামে কৃষিজাত শস্যে জীবন কাটাইয়া গিয়াছিলেন। মুকুন্দরামের সময়ে প্রজার পাপে মামুদ সরিফ নামে কোনও ব্যক্তি দামুন্যার ডিহিদ্যার হইল। যেমন ডিহিদার, তেমনই উজীর। তাহারা ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের শত্রু হইল। জমীর কোণে কোণে দড়ী ফেলিয়া মাপিতে লাগিল, এবং তাহাতেও তুষ্ট না হইয়া পনর কাঠায় বিঘা ধরিয়া কর বসাইল। প্রজার 'গোহারি' শুনিল না, পতিত জমী উর্ব্বরা বলিয়া লিখিয়া কর আদায় করিতে লাগিল। পোদ্দার ৵১০ আনায় টাকা ধরিয়া প্রত্যহ এক পয়সা সুদ লইতে আরম্ভ করিল। ধান গোরু কিনিবার লোক নাই। দামুন্যার

এক মহাজনকে ডিহিদার বন্দী করিয়া লইয়া গেল। প্রজারা কোথাও পলাইয়া যাইতে পারিল না, তাহাদের দুয়ার জুড়িয়া পেয়াদা থানা দিয়া বসিল। কেহ কেহ ব্যাকুল হইয়া ৷৷৵০ আনায় টাকা হিসাবে ধান গোরু বেচিতে লাগিল। ক্লেশ আর সহ্য করিতে না পারিয়া মুকুন্দরাম ভাই রামানন্দকে সঙ্গে লইয়া সাত পুরুষের বাস ত্যাগ করিলেন। পথে এক দস্যুর হাতে পড়িয়া তিনি এমন নিঃসম্বল হইলেন যে, অন্যের নিকট পাথেয় পর্য্যন্ত ভিক্ষা করিতে হইল। মুকুন্দরাম স্ত্রী পুত্র ভাই লইয়া নানা গ্রাম ও নদী পার হইয়া চলিতে লাগিলেন। এক দিন কিছুমাত্র সম্বল ছিল না। তাঁহাকে তৈল বিনা স্নান করিতে হইল, এবং কেবল উদক পান করিয়া প্রাণ রাখিতে হইল। কিন্তু শিশুপুত্র ত বুঝে না; ক্ষুধায় কাঁদিতে লাগিল। তিনি এক পুকুর আড়ায় (পাড়ে) শালুক নাড়া (কুমুদ ফুলের নাল) নৈবেদ্য দিয়া ইষ্টদেবতার পূজা করিলেন। ক্ষুধা, ভয় ও পরিশ্রমে সেই পুকুরপাড়ে ঘুমাইয়া পড়িলেন। সেই সময় চণ্ডী তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া অভয়া-মঙ্গল-গীত রচনার আদেশ করিলেন। তার পর মুকুন্দরাম মেদিনীপুর জেলার ব্রাহ্মণভুমি পরগণার আরড়া গ্রামের ব্রাহ্মণ রাজার নিকট উপনীত হইলেন, কবিত্ববাণী শুনাইয়া রাজাকে সম্ভাষণ করিলেন। রাজা বাঁকুড়া রায় দশ আড়া ধান দিলেন, এবং তাঁহাকে পুত্র রঘুনাথ রায়ের গুরু (গুরুমহাশয়) এবং নিজের সভাসদ্ নিযুক্ত করিলেন।

এখানে মুকুন্দরাম নির্ব্বিঘ্নে ছিলেন বটে, কিন্তু দামুন্যার তরে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। কারণ, তিনি বুঝিতেন, 'যেই জন পরাধীন, সে জন অবশ্য দীন, সুখ দুঃখ নাহিক বিশেষ।"

কি দুঃখেই মুকুন্দরাম এই গান রচনা করিয়াছিলেন!

তেলেগু দেশ

অনেকদিন হইতে তেলেগুদেশ দেখিবার বাসনা ছিল। এক্ষণে কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ যাইতে কোন ক্লেশ নাই। মাদ্রাজের ডাক-গাড়ী ও যাত্রীর গাড়ী প্রত্যহ গমনাগমন করিতেছে, আমরা জ্যৈষ্ঠ মাসে অবসর পাইয়া গোদাবরী-দর্শনে যাত্রা করিয়াছিলাম।

বাঙ্গালা দেশ ছাড়িয়া সুবর্ণরেখা নদী পার হইলেই ওড়িয়া দেশ আরম্ভ। ওড়িয়া দেশের পরেই তেলেগু দেশ। চিল্কা হ্রদ পার হইতে না হইতেই উহার আরম্ভ। ওড়িয়া ও তেলেগু দেশের মধ্যস্থলে নদী বা পর্ব্বত বা অপর কোন প্রাকৃতিক সীমা নাই। বস্তুতঃ পূর্ব্বকালে ওড়িয়া দেশ এখনকার অপেক্ষা আরও দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন প্রাচীন ওড়িয়ার খানিকটা মাদ্রাজ মণ্ডলের অন্তর্গত হইয়াছে।

তেলেগু দেশের প্রধান নগর বহরমপুর, সংক্ষেপে বরম্‌পুর, সাধু ভাষায় ব্রহ্মপুর। বাঙ্গালার বহরমপুর হইতে পৃথক্ করিবার নিমিত্ত এই বহরমপুরকে গঞ্জাম-বরম্‌পুর বলিতে হয়। কটক হইতে সন্ধ্যার সময় ডাকগাড়ীতে বরম্‌পুর যাত্রা করিয়া আমরা রাত্রি প্রায় ২টার সময় বরম্‌পুর ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। বামে বিস্তীর্ণ চিল্কা হ্রদ, দক্ষিণে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন পাহাড়-শ্রেণীর মধ্য দিয়া আমাদিগকে অনেক পথ যাইতে হইল। জ্যোৎস্নার আলোতে চিল্কাকে সমুদ্রতুল্য বোধ হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে রেল চিল্কার জলের ধার দিয়া গিয়াছে। চিল্কা লম্বায় প্রায় ৩০ মাইল, চওড়ায় হারাহারি প্রায় ২০ মাইল। জলের মধ্যে দ্বীপ হইয়াছে; পাহাড় জলের উপরে মাথা উচু করিয়া রহিয়াছে। যাঁহারা ভাবুক, এবং যাঁহারা

শহরের কেবল বাড়ী দেখিয়া দেখিয়া বিরক্ত, তাঁহারা রম্ভার নিকটস্থ চিল্কা দেখিয়া পরম প্রীত হইবেন। প্রসিদ্ধ উৎকল কবি ৺রাধানাথ রায় 'চিলিকাতে' কত শোভাই দেখিয়াছেন, কত ভাবের উচ্ছ্বাসে তাঁহার 'চিলিকা' পূর্ণ হইয়াছে।

ডাক-গাড়ী কিন্তু এত ভাবিতে এত দেখিতে সময় দেয় না। আমাদিগকে গভীর রাত্রে বরম্‌পুরে আনিয়া ফেলিল। ষ্টেসনে নামিয়াই জানিলাল, তেলেগুদেশে পথিকের নিমিত্ত ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় না। সাহেবরা ও দুই এক জন ধনী লোক ঘোড়ার গাড়ী রাখেন।

ষ্টেসন হইতে কিছু দূরে আমাদের নিমিত্ত বাসা নির্দ্দিষ্ট ছিল। এক ওড়িয়া ভদ্রলোকের অনুগ্রহে আমরা ঘোড়ার গাড়ী পাইয়াছিলাম। তাঁহার নাম শুনিলে অনেক বাঙ্গালী-পাঠক নিশ্চিত বিস্মিত হইবেন। নামটি, ডেনিয়াল মহান্তী, তাঁহার একপুত্রের নাম জোন্‌স মহান্তী. অন্য একজনের নাম, ভাস্কর মহান্তী। পরে জানিলাম, তিনি খ্রীষ্টসম্প্রদায়ভুক্ত, তাই এমন বিচিত্র নাম। আমাদের কাছে এই রকম নাম আর বিচিত্র ঠেকে না। কটকে খ্রীষ্টসম্প্রদায়ভুক্ত অনেক ওড়িয়ার এই প্রকার নাম শুনিতে পাওয়া যায়। জন, জেকব, জোন্‌স, রিচার্ড, ফিলেমন প্রভৃতির পরে পাত্র, দাস, মহান্তী ইত্যাদি যথেষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। বোনাপার্ট সাহু, রিচার্ডচন্দ্র দাস ইত্যাদি নামের অর্থ করিতে ভবিষ্য মানবকুল অক্ষম হইবে। তবে, কালোহি দুরতিক্রমঃ। কালকে এড়াইবার সাধ্য কি? নাম-সঙ্কর কালমাহাত্ম্যেরই পরিচয় দিতেছি।

প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া দেখি আমাদের বাসার প্রায় চারিদিকেই স্থানে স্থানে পাথর মাথা উচু করিয়া আছে, এই পাথর বিলক্ষণ শক্ত; এত শক্ত যে সহজে কাটিয়া আকার দিতে পারা যায় না। তাই ওড়িয়া ভাষায় এই রকম পাথরকে অকর্ম্মশিলা বলে। ইংরেজী "নীস" বলা

অপেক্ষা অকর্ম্মশিলা বলাই ভাল। শহরের ভিতরে ভিতরে স্থানে স্থানে এইরূপ পাথর কোথাও উচ্চ হইয়া কোথাও বা চারিদিকের ভূমির সহিত মিশিয়া রহিয়াছে, বস্তুতঃ এখান হইতে পূর্ব্বঘাট-গিরিশ্রেণীর আরম্ভ বলা যাইতে পারে। রাজমহল হইতে আরম্ভ করিয়া ওড়িষ্যার অরণ্য দেশের পাহাড়-সমূহকে পূর্ব্বঘাটের অন্তর্গত মনে করিবার হেতু আছে। পশ্চিমঘাট আরব সাগরের কত নিকটে, সাগরের ঠিক ঘাটই বটে; কিন্তু পূর্ব্বঘাট সেরূপ নয়। সমগ্র দক্ষিণাপথ পার্ব্বত্য দেশ। তাহার মধ্যে উচু নীচু পাহাড় থাকিবেই। পূর্ব্বদিকের এই সকল খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন পাহাড়কেই পূর্ব্বঘাট বলিতে হয়। অতএব নামটি তত সার্থক হয় নাই। অন্ততঃ পূর্ব্বঘাট ও পশ্চিমঘাট এক প্রকার নহে।

পার্ব্বত্য দেশ বলিয়া তেলেগু দেশে জলের কষ্ট। বরম্‌পুরে অনেক পুষ্করিণী আছে বটে, কিন্তু একটারও জল মিষ্ট নহে। কূপের জল বরং ভাল, কিন্তু মহানদীর মত সুমিষ্ট জল কেবল গোদাবরীতেই পাইয়াছিলাম। কি বরম্‌পুরে, কি অন্যত্র পাথর-বাঁধান কূয়া আছে, কিন্তু জল ক্ষারীয় বিস্বাদ। একে গ্রীষ্মকাল তাহাতে জলের কষ্ট; তার উপর এখান হইতে দ্রাবিড় ভাষার ল-ড-প্রধান শব্দের আরম্ভ। কথা বুঝিবার জো নাই, শব্দ উচ্চারণ করিতে পারা যায় না, কেবল হাডুডুডু বলিয়া বোধ হয়। আর এক বিচিত্র, বাসা হইতে বাহির হইয়া যে দিকেই দেখি, সেইদিকেই বড় বড় তেঁতুল গাছ। এক স্থানে কেবল তেঁতুল গাছের একটা বাগান দেখিতে পাইলাম। তখন মনে হইল, ঝাল লঙ্কা ও তেঁতুল না হইলে তেলেগু ভায়াদের ভোজন সমাধা একদিনও হয় না। বাল্যকালে শুনিয়াছিলাম, তেঁতুল গাছের হাওয়ায় যত রোগ টানিয়া আনে। কিন্তু তেলেগুদের বলিষ্ঠ দেহ দেখিয়া কথাটায় আর বিশ্বাস রহিল্ না। শুধু বরম্‌পুর কেন, প্রসিদ্ধ ভিজিয়ানাগ্রামে ও বিশাখাপত্তনেও শহরের বসতির মধ্যে বড় বড়

তেঁতুল গাছ। রাজমহেন্দ্রীতে তরিতরকারির বাজারে গিয়া দেখি তেঁতুল-ভরা ঘরে বসিয়া দোকানদার সের সের তেঁতুল বিক্রয় করিতেছে। পাশের আর এক খান ঘরে বড় বড় টাবা নেবুর মত এক রকম নেবু—বোধ হয় খুব টক—স্তূপাকার হইয়া আছে। পাশের আর এক দোকানে লঙ্কার সেইরূপ স্তূপ। এমন ঝাল যে, জিহ্বা স্পর্শ-মাত্রে জ্বালায় অস্থির হইতে হয়। যে দেশে কুটুম্বের তত্ত্বের মধ্যে লাল লঙ্কা (মির কাইলু) প্রেরিত হয় সে দেশে উহা নিশ্চিত উপাদেয়। গঞ্জাম-জেলার পার্লাখেমড়ী নামক রাজ্যে তিন চারি ক্রোশ ব্যাপিয়া চিন্তাপাণ্ডুর (তেঁতুলের বাগান) আছে।

তেলেগুদিগের গৃহ-নির্ম্মাণে কিছু বিশিষ্টতা আছে। উচ্চ 'পিণ্ডা', খোলার চাল, গেরিমাটির লাল রঙ্গ, ইটের থামের মতন পরিবর্ত্তুল, কিন্তু ক্রমশঃ সরু লাল রঙ্গলিপ্ত কাঠের খুঁটী; ঘরগুলি দেখিতে মন্দ নয়। নিকান, পুছান, পরিষ্কার; লাল রঙ্গের কাঁথে শাদা চিত্র; মন্দ দেখায় না। শহরগুলিও বাহিরে বেশ পরিষ্কার, তবে বাড়ীর ভিতরে যত ময়লা। ছোট ছোট ঘর, ছোট ছোট বাড়ী, তার মধ্যে ময়লা। তবে কি না, সকলের চোখ সমান নয়, নাকও সমান নয়। বাঙ্গালা দেশের অনেক শহরে নাক টিপিয়া চলিতে হয়। পরিষ্কার শহর কলিকাতা, কিন্তু প্রথম প্রথম দুই তিন দিন শ্বাস রুদ্ধ হইবার জো হয়। বরম্‌পুরে একদিন থাকিয়া আমরা প্রসিদ্ধ বিজিয়ানাগ্রাম যাত্রা করিলাম। ইংরেজীর অনুকরণে আমরা কখনও বিজিয়ানাগ্রাম, কখনও বা ভিজিয়ানাগ্রাম করিয়া ফেলি; বস্তুতঃ আসল নাম বিজয়নগর। তেলেগু ভাষার প্রকৃতি অনুসারে শেষে ম্‌ আসে, ফলে বিজয়নগরম্‌ হয়। বিজয়নগরম্‌কে বরং 'বিজিয়ানাগ্রাম' বলিলে তেলেগু ভদ্রলোক মার্জ্জনা করিতে পারেন, কিন্তু ভিজিয়ানাগ্রাম বলিলে অশিক্ষিত মনে করিবেন।

বিজয়নগরম্‌ ষ্টেসনটি ছোট, কিন্তু লতাপাতায় সুন্দর। এক তেলেগু

ভদ্রলোক ষ্টেসন-মাষ্টার, পায়ে তেলেগু চটি, গায়ে শাদা ইংলিশ-কোট, পরণে মুক্তপ্রান্ত লম্বিত-কচ্ছ, ছোট কিন্তু চওড়া ধুতি, মাথায় পাগড়ী। ইহাই তেলেগু ভদ্রলোকদিগের সভ্য পরিচ্ছদ। ভুলিয়াছি, ললাটে ত্রিপুণ্ড্র। বস্তুতঃ তেলেগুদিগের পরিচ্ছদ দেখিলেই তাহাদিগকে আর্য্যেতর জাতি বলিয়া বোধ হয়, কি রকম কাপড় চোপড় পরিলে ঠিক মানাইবে, যেন এখনও তাহা স্থির করিতে পারে নাই। একথা পরে হইবে।

বরম্‌পুরে যদি বা ওড়িয়া কিছু কিছু চলে, বিজয়নগরে কেবল তেলেগু। যাঁহারা মনে করেন, হিন্দী জানিলে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত লোকের সহিত কথোপকথন করিতে পারা যায়, দ্রাবিড় দেশে আসিলে, তাঁহাদের এই ধারণা পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। বাঙ্গালা, হিন্দী, মরাঠী, ওড়িয়া,—সকলই সংস্কৃত-মূলক। ইহাদিগের সাধু ভাষা কতকটা বুঝিতে পারা যায়, এবং এক একটি খাঁটি সংস্কৃত শব্দ শুনিলে প্রথম প্রথম আশ্চর্য্য বোধ হয়; কিন্তু তেলেগু ভাষার প্রত্যেক শব্দই নূতন।

অত্যল্প তেলেগু হিন্দী বুঝে; তাহারা হয়ত কর্ম্মোপলক্ষে পশ্চিমে বেড়াইয়া আসিয়াছে। অন্যদিকে, বঙ্গদেশ অপেক্ষাও ইংরেজীর চলন অধিক মনে হয়। দক্ষিণে মাদ্রাজের দিকে যতই যাওয়া যায় ইংরেজীর চলন তত অধিক। গোশকট-চালক পর্য্যন্ত ইংরেজী কথা বলিয়া আশ্চর্য্যান্বিত করে। বাজারে ইংরেজী পৌণ্ডে পিতল-কাঁসা বিক্রয় হয়। বিদেশীয় ভাষায় গোলযোগে পড়িতে না হয়, এই হেতু কলিকাতায় অনেক সাহেব বাড়ীতে তেলেগু খানসামা, তেলেগু আয়া নিযুক্ত করিয়া থাকেন। ওড়িষ্যায় শিক্ষিত ভদ্রলোক মাত্রেই বাঙ্গালা জানেন, লিখিতে না পারিলেও ছাপা পড়িতে ও শুদ্ধ বলিতে পারেন। কিন্তু ওড়িষ্যা ছাড়িয়া দক্ষিণে গেলেই বাঙ্গালা ভাষার শেষ দেখা যায়। আমরা প্রাতে বিজয়নগরে উপস্থিত হইলাম। ষ্টেসন হইতে বাহির হইবামাত্র এক সুন্দর

দৃশ্য চোখে পড়িল। এক বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা, যদিও সমগ্র জলপূর্ণ নহে, তিন পাশের দূরস্থ পাহাড়মালার বেষ্টনে মনোরম। ইহার অপর পাশে মহারাজার দুর্গ-প্রাসাদ ; বামে নগর, দক্ষিণে তাল-নারিকেলের বন। নগরের পশ্চাতে পাহাড়, যেন পাহাড়ের কোলে নগরটি স্থাপিত ; পূর্ব্বকালের গিরিদুর্গ। কিন্তু সেই জলের কষ্ট। পাথর বাঁধান কূপ অনেক আছে, কিন্তু কূপে জল অল্প, নাই বলিলেই হয়। দলে দলে স্ত্রীলোকে মাথায় বড় বড় কলশ লইয়া কূপের নিকট জনতা করিয়া থাকে। প্রত্যেকের হাতে জল তুলিবার নিমিত্ত তালপাতার ঠোঙ্গা। ঠোঙ্গা হাল্‌কা, অথচ দুই ঘটী জল অনায়াসে উঠে, কূয়ার গায়ে ঠেকিয়া ভাঙ্গিবার নহে। রাজমহেন্দ্রীতে এই প্রকার ঠোঙ্গা টীনের হইয়া থাকে। কলাই-ভাঙ্গা যাঁতার একটা পাটী মাঝামাঝি কাটিয়া তাহাকে ফাঁপা করিলে যেমন দেখায়, ঠোঙ্গার আকার তেমনই।

অপরাহ্নে আমরা মহারাজার প্রাসাদ দেখিতে বাহির হইলাম। দুর্গের ভিতরে ঢুকিতে হইলে এক কর্ম্মচারীর অনুমতি লইতে হয়। আমাদের সঙ্গী দোভাষী যুবক অনুমতি আনিলেন। কিন্তু ভিতরে ঢুকিয়া যেই অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইব, দ্বারবানেরা আমাদিগকে জুতা ত্যাগ করিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল। আমরা থামিয়া গেলাম। দেবালয় নহে, ভিতরের বাড়ীও নহে, বাহির বাড়ীতে ঢুকিতে জুতা কেন খুলিব তাহা বুঝিতে পারিলাম না। শেষে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, দেশীয় লোক মাত্রেই জুতা খুলিয়া যায়, কেবল সাহেবেরাই জুতা ও বুট-পায়ে ভিতরে ঢুকিতে পারেন। যখন বলিলাম, আমরা বাঙ্গালী, জুতা খুলি না, তখন ভৃত্যেরা খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া রহিল, এমন নূতন কথা যেন কখনও শোনে নাই। কারণ তেলেগুদেশে পাদুকা পরিচ্ছেদের মধ্যে নহে। বেশভূষা করিয়া ভদ্রলোক পাদুকাহীন পদে রাজপথে স্বচ্ছন্দে চলিয়া বেড়ায়। যাঁহারা পাদুকা ধারণ করেন, তাঁহারা পাদুকাহীন হইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ

বোধ করেন না। পথে পুলিশ-প্রহরী, মাথায় লাল বোঁচা পাগড়ী, গায়ে খাকী কোট, পাজামা, কিন্তু পা খোলা। জমাদার পোষাক আঁটিয়াছেন, কিন্তু খালি পায়ে নিজের গাম্ভীর্য্য যেন রাখিতে পারিতেছেন না। সে দেশে জুতা পরা অসাধারণ, তাহাতে আমরা জুতাশুদ্ধ বাড়ীর ভিতরে ঢুকিতে চাই! যাইতে হইলে একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক। বস্তুতঃ তাঁহাকে এ নিমিত্ত কমিটি বসাইতে হইবে কি না, আমরা তাহাই ভাবিতে ভাবিতে ভিতরে যাইবার আশা ত্যাগ করিয়া মহারাজার উদ্যান দেখিতে গেলাম। সেখানে জুতার ভাবনা নাই, কেননা বাগানটি বিলাতী-ধরণের, মাঝে জলের ফোয়ারা, একপাশে 'টেনিস' খেলিবার স্থান। মহারাজা যুবা, একজন সাহেব শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছেন। জাতিতে ক্ষত্রিয়, কিন্তু আচার-ব্যবহারে তেলেগু। এইরূপ ওড়িষ্যার এক এক সামন্ত রাজ্যের রাজা ক্ষত্রিয়, কিন্তু আহার-বিহারে আচার-ব্যবহারে ওড়িয়া হইতে পৃথক্ করিতে পারা যায় না। কেবল আহারের ও বিহারের সময় ক্ষত্রিয় বলিয়া জানিতে পারা যায়। বিজয়নগরের মহারাজার আয় প্রায় ৩৬ লক্ষ টাকা, পদগৌরব বিলক্ষণ আছে; তবে নামে মহারাজা, রাজ-ক্ষমতায় বাঙ্গালাদেশের জমিদার।

বিজয়নগরের জরি-দেওয়া উৎকৃষ্ট ধুতি ও শাড়ী তেলেগু-তাঁতীর নৈপুণ্য প্রকাশ করে। বাঙ্গালার মুরশিদাবাদ-বহরমপুরের মত গঞ্জাম-বরম্‌পুর গরদের ধুতি-শাড়ীর নিমিত্ত প্রসিদ্ধ। এক এক গরদের ধুতি ২৫৲।৩০৲ টাকায় বিক্রয় হয়। বিজয়নগরের কার্পাস-বস্ত্রের উপর জরির পাড়। ধুতি লম্বায় ৮।৯ হাত, বহরে প্রায় ৩ হাত, চাদর ৬ হাত, ধুতি-চাদরে ১৪ হাত। শাড়ী ১০।১২।১৩ হাত। ১৪৲।১৫৲ টাকায় একরকম চলনসই এক জোড়া ধুতি বা শাড়ী পাওয়া যায়। ২৫৲।৩০৲

টাকায় যাহা পাওয়া যায় তাহাও নাকি খুব উৎকৃষ্ট নয়। এই সকল ধুতি-শাড়ী তত সরু সূতার নয়, বাহাদুরী সূতার পাইটে, সমান বোনাতে।

আমরা বিজয়নগরে একদিন থাকিয়া প্রাতে ৭টার ডাক-গাড়ীতে রাজমহেন্দ্রী যাত্রা করিলাম। বেলা প্রায় ৩টার সময় প্রখর গ্রীষ্মের রৌদ্র ভোগ করিয়া রাজমহেন্দ্রী ষ্টেসনে পঁহুছিলাম। গোদাবরীর উপরেই রাজমহেন্দ্রী নগর। কিন্তু ষ্টেসন হইতে নগর প্রায় দুই মাইল দূরে, অথচ ঘোড়ার গাড়ী নাই। একজন ভদ্রলোক ভাড়া দিবার নিমিত্ত দুইখানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়াছেন। দেখিলে বোধ হয়, গরুর গাড়ীকে কোন রকমে ঘোড়ার গাড়ী করিয়াছেন। যেমন গাড়ী, তেমনই ঘোড়া; তার উপর পথের লোক সরাইবার অভিপ্রায়ে তেলেগু চালকের চীৎকার। ওড়িয়া মাঝীর নৌকায় চড়িয়া নদী পার হইয়াছি, নৌকা ছাড়িবার সময় সে কলরব, সে ব্যস্ততা বেশ মনে আছে, এবং নৌকা ঠিক চলিবার সময় মাঝীর মুখের গাম্ভীর্য্য, সাহসিকতার লক্ষণ বেশ মনে হইতেছে; যেন প্রতিক্ষণে তাহারা যাত্রীকে বলিতে থাকে, দেখ জলরূপ ভূতের বুকে চড়িয়া যাইতেছি, অথচ ভয় করি না! সেইরূপ রাজমহেন্দ্রীতে তেলেঙ্গা গাড়োয়ানের অশ্বচালনা দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, বনের জানোয়ার ধরিয়া গাড়ী চালান সোজা কথা নহে। যাহাহউক, রাজমহেন্দ্রীর পথিক-জনকে ডাকিয়া আপনাদিগকে দেখাইতে দেখাইতে বাসায় পঁহুছিলাম।

বাসাটি দোতলা, নূতন তৈয়ারী, সেখানকার সবজজ-মহাশয়ের। সবজজের নামের গুণেই হউক, বা নূতন বাড়ী বলিয়াই হউক, দেখিলাম শহরের প্রায় সকলেই বাড়ীটি চেনে। কিন্তু হায়! সন্ধ্যার সময়ের ঘোর বৃষ্টির সমস্ত জল বাহিরে না পড়িয়া ঘরের ভিতরেই পড়িতে লাগিল। রাত্রে শুইবার তিলার্দ্ধ স্থান রহিল না। উপরে পাকা ছাত করিয়া সবজজ মহাশয় কি বিষম ভুলই করিয়াছেন। দেওয়ালের সঙ্গে ছাতের

জোড় মেশে নাই, অবিরল-ধারা-বিগলনের পক্ষে কোন বাধাই ছিল না। বলিতে ভুলিয়াছি, তেলেগু দেশে পাকা বাড়ী থাকিলেও পাকা ছাত প্রায় নাই। যেমন বাড়ীই হউক, রাজার হউক, সরকারী আফিস-আদালত হউক, রেলের ষ্টেসন হউক, উপরে মাটির খোলা; লাল খোলা পরিপাটী সাজান, কোথাও বা দুই তিন প্রস্ত খোলা। দূর হইতে দেখিতে বেশ সুন্দর, খোলা খুব মজবুত, দেশে বানর নাই, ভাঙ্গেও না। ছাইবার গুণে ঘোর বৃষ্টিতেও বিন্দুমাত্র জল ঘরের ভিতরে পড়ে না।

প্রাতে কিন্তু নির্ম্মলসলিলা গোদাবরী দেখিয়া আমাদের মন প্রসন্ন হইল। শীঘ্র স্নানাহ্নিক সমাপন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। কিন্তু সুখশান্তি কোথায়? ওড়িষ্যা-ক্ষেত্র ছাড়িয়া পাণ্ডাদের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু, হায়, একদল তেলেগু পাণ্ডাদের হাডুডুডু শব্দে কাণের সূক্ষ্ম ঝিল্লী বিলক্ষণ ক্ষুব্ধ হইতে লাগিল। গোদাবরী-তীর্থে স্নান করিতে আসি নাই, বুঝায় কে? গোদাবরী যে আদি-গঙ্গা নহে, তাহার প্রমাণ হৃদয়ঙ্গম করায় কে? নিরুত্তর দেখিয়া একজন পাণ্ডা সংস্কৃত ভাষার আশ্রয় লইল। কিন্তু বলিতে কি, হাডুডুডু বরং ছিল ভাল, দেবভাষার বিকৃত উচ্চারণে কর্ণ ব্যথিত হইতে লাগিল। যাহাহউক, স্নান-সঙ্কল্প না করিয়া পরিত্রাণ পাইলাম না; তটে মার্কণ্ডেশ্বরের মন্দির, সেই ঘাটে স্নান করিয়া কোটিজন্মের পাপ ধৌত করা গেল। তিন মাইল দূরে কোটিলিঙ্গম্ ছিল; সেখানে যাইতে পারিলে ভবিষ্যতের কোটিজন্মের পাপও মোচন হইতে পারিত। গোদাবরীতে অগাধ জল, বিস্তারে দুই মাইল; কিন্তু কটকে মহানদীর তুল্য 'আনিকট' দ্বারা বাঁধা। রাজমহেন্দ্রী হইতে তিন মাইল নীচে গোদাবরীর চারি মুখ চারিটা বাঁধে আবদ্ধ হইয়াছে। চারিটা বাঁধের মাঝে মাঝে তিনটা খাল দূরস্থিত কৃষিক্ষেত্রে জল সেচন করিতেছে। এদিকে রেল-গাড়ী যাইবার নিমিত্ত দুই মাইল লম্বা সেতু

গোদাবরীর বুকের উপর দাঁড়াইয়া আছে। একখানা ছোট ইষ্টীমার এ-পারের লোক ও-পারে লইয়া যাইতেছে।

কটকে আম ফুরাইয়া আসিয়াছিল, রাজমহেন্দ্রীতে তখনও মাবুড়ি-পাণ্ডুলু (আম) অপর্য্যাপ্ত। এ সব অঞ্চলে চাল্‌তার আকারের এক রকম আম পাওয়া যায়। স্বাদে ও অন্যান্য গুণে ছোট ফজ্‌লী বলিয়া ভ্রম হয়। রেলের অনুগ্রহে এই আম 'ইজানগর' (বিজয়নগর) হইতে কটকে রপ্তানি হইতেছে। কিন্তু কলিকাতায় এই আম কখনও দেখি নাই। বোধ করি, আম-বেপারী এই আমের সন্ধান জানে না। নইলে, যখন কলিকাতায় আম উঠিতে আরম্ভ করে না, তখন এই চাল্‌তা আমে দু-পয়সা লাভ হইতে পারে। বিজয়নগরের মহারাজারই না কি আমের শতাধিক বাগান আছে। সেখানে, বিশাখাপত্তনে আমের কলম যথেষ্ট পাওয়া যায়। বিজয়নগরে আমরা এই আম টাকায় ১২টা, বিশাখাপত্তনে ২০টা, রাজমহেন্দ্রীতে ২০টা করিয়া কিনিয়াছিলাম। ইহা ছাড়া অন্য অনেক রকম আম পাওয়া যায়, সে গুলির মধ্যে বাছিয়া লইতে পারিলে বঙ্গদেশের আমের সংখ্যা বাড়াইতে পারা যায়। এখানকার আনারসেরও প্রশংসা করিতে পারা যায়।

বোধ হয় কলিকাতার ফল-বেপারী জানে না যে, ওড়িষ্যায় সমুদায় ফল বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা অন্ততঃ ১৫ দিন আগে পাকে। কোন-কোন ফল এক মাস আগেও পাকে। কটকে মাঘ-মাসে তরমুজ পাকে, আম বৈশাখ-মাসে প্রচুর, পাকা তাল পৌষ-মাসে পাওয়া যায়। ওড়িষ্যা ফলের দেশ নহে, কিন্তু আম কাঁঠাল আনারস প্রভৃতি যে দুই চারিটা আছে, তত ভাল না হইলেও আগে পাকিবার গুণে বঙ্গদেশে আদর পাইতে পারে। বোধ হয়, ওড়িষ্যার গ্রীষ্মাধিক্যই ফল আগে পাকিবার কারণ।

তেলেগুদিগের ধুতি শাড়ী উড়ানীর ছাপা পাড় দেখিয়া প্রথমে মনে

হইয়াছিল, সে সকল কাপড় সে দেশে জন্মিয়া থাকে। এক কালে এ দেশ ছাপা কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। মসলিপত্তন এখনও এই দুর্দ্দিনে পূর্ব্ব-খ্যাতি কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু সমুদয় রাজমহেন্দ্রীর বাজার তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম, মসলিপত্তনের দুই দশ থান নিকৃষ্ট ছাপা ছাড়া সমুদয় ছাপা কাপড় বিলাতী! কলিকাতার বাজারে বিলাতী ধুতি-চাদর দেখিয়া প্রথম প্রথম মনে হয়, বুঝি, বাঙ্গালা দেশ ছাড়িলে বিলাতী ধুতি-চাদরও সঙ্গ ছাড়িবে। কিন্তু তেলেগু রমণীর নিমিত্ত ১২।১৪ হাত শাড়ী হইতে পুরুষদের নিমিত্ত ৮।৯ হাত ধুতি ও তদনুরূপ চাদর বিলাতে বোনা হইয়া ও পাড় ছাপা হইয়া তেলেগু দেশের বাজার পূর্ণ করিয়াছে।

দেশীয় আচার-ব্যবহার রক্ষা করিতে রমণীরাই সমাজের চিরসহচরী। তেলেগুদিগের মধ্যে 'জেনানা' নাই বটে, কিন্তু রমণীগণ প্রাচীন বেশভূষা ত্যাগ করেন নাই। জেনানায় অভ্যস্ত লোকের নিকট অ-জেনানা দেশের মুক্তভাবে স্বচ্ছন্দমনে নিঃসঙ্কোচে বিচরণশীলা গৃহলক্ষ্মীগণ প্রথম প্রথম বিস্ময় উৎপাদন করেন। বাঙ্গালীর মেয়ে বাড়ীর বাহির হইলেই জড়পুটুলী। কি যেন বিষম বিপদে পড়েন, কে যেন দেখিতে পাইল, কে যেন তাকাইয়া আছে, এই ভাবনাতেই কাতর। কিন্তু তাঁহারা যদি মরাঠী বা তেলেগু রমণীর স্বচ্ছন্দতা, নির্ভয়ে গমনাগমন, মুখের ভদ্রোচিত গাম্ভীর্য্য দেখিতেন, তাহা হইলে অনেক শিখিতে পারিতেন।

তেলেগুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি চতুর্বর্ণ দেহের বর্ণ দেখিয়া প্রায় চিনিতে পারা যায়। গৌরবর্ণ ব্যক্তি মাত্রেই ব্রাহ্মণ, শূদ্র ও বৈশ্যবর্ণ মাত্রেই কৃষ্ণবর্ণ। ক্ষত্রিয় আছে কি না, জানি না; একজনও দেখি নাই। গৌরবর্ণ দেখিয়া ব্রাহ্মণ ঠাওরাইতে প্রায় ভুল হয় না। ব্রাহ্মণেরা এক প্রকার তিলক কাটিয়া থাকেন, তাহা দেখিয়াও ব্রাহ্মণ বলিতে সংশয় থাকে

না। তেলেগু ব্রাহ্মণ সুপুরুষ, বলিষ্ঠ। ব্রাহ্মণ-রমণী অবশ্য গৌরী; কিন্তু বোধ হয়, তেলেগু রমণী অপেক্ষা পুরুষ সুশ্রী।

গোদাবরী হইতে প্রত্যাগমনকালে আমরা ওয়াল্‌তেরে আসিলাম। এই স্থানটি স্বাস্থ্যকর বলিয়া খ্যাতি হইয়াছে। তার উপর, সমুদ্রকূলে স্থাপিত বলিয়া লোকের দৃষ্টি সহজে পড়িয়াছে। ওয়াল্‌তের কিন্তু দুইটি—একটি পুরাতন, অপরটি নূতন, উভয়ের মধ্যে ব্যবধান প্রায় দুই মাইল। তেমনই, নূতন ওয়াল্‌তের ও বিশাখাপত্তনের মধ্যে ব্যবধান প্রায় দুই মাইল। তিনটিই সমুদ্রকূলে; মধ্যে নূতন ওয়াল্‌তের, দক্ষিণে বিশাখাপত্তন, উত্তরে পুরাতন ওয়াল্‌তের। বিশাখাপত্তন, তেলেগু ভাষায় বিশাখাপত্তনম্। ইংরেজীতে হইয়া গিয়াছে ভিজিগাপাটম; সংক্ষেপে সাহেবেরা 'ভাইজাগে' দাঁড় করাইয়াছেন। বিশাখাপত্তন জেলা; সেখানে জজ-মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির আফিস আছে। কিন্তু সাহেবেরা প্রায় সকলেই নূতন ওয়াল্‌তেরে বাস করেন। এইরূপে সাহেবী পাড়া হইতে নূতন ওয়াল্‌তেরের জন্ম হইয়াছে। সেখানে সাহেব ভিন্ন অন্য লোকের বাস নাই। তাঁহাদের 'ক্লব' সেখানে। এই ক্লবের মেনেজার, একজন বাঙ্গালী। তাঁহারই সাহায্যে নূতন ওয়াল্‌তেরে আমরা একটি ভাল বাড়ী পাইয়াছিলাম।

তেলেগু দেশে প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা মনে হইতেছে। দেখিলাম এমন প্রসিদ্ধ স্থান নাই, যেখানে বাঙ্গালী নাই। বরম্‌পুরে একজন বাঙ্গালী উকীল, তথায় মান্যগণ্য। রাজমহেন্দ্রীতে একজন বাঙ্গালী কবিরাজি করিতেছেন, তাঁহার দুই একজন আত্মীয় সেখানে কণ্ট্রাক্টরি করেন। সেখানেই স্কুলের আসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্টর একজন বাঙ্গালী। বিশাখাপত্তনে ঈষ্ট-কোষ্ট-ট্রেডিং-কোম্পানী নামে বাঙ্গালীর দোকান, ওয়াল্‌তেরে ক্লবের মেনেজার বাঙ্গালী ছাড়া আরও কয়েকজন আছেন। দক্ষিণে বেজওয়াডায় না-কি একটি ছোটখাট বাঙ্গালী পাড়া হইয়াছে। তেলেগুরা বাঙ্গালীদিগকে

শ্রদ্ধা করে। শিক্ষিত তেলেগু মনে করেন, বাঙ্গালী এক অদ্বিতীয় জাতি। গোদাবরীতে কোন তেলেগু ভদ্র লোককে বাঙ্গালীর প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধাবান্ দেখিলাম। পাছে এই শ্রদ্ধার হঠাৎ অবসান হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহাকে একটু সতর্ক করিয়া দেওয়া আবশ্যক মনে হইল। বাঙ্গালীর মধ্যে কাপুরুষ ও দুরাচার আছে ; সকলেই সাধু সজ্জন নহে। প্রবাসী কয়েক-জন বাঙ্গালীর চরিত্র শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। তাঁহারা নিজেদের অযাচিত মানসম্ভ্রম হেলায় হারাইয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী জাতির নামে কলঙ্ক আনিয়াছেন।

কি কথা বলিতে বলিতে কি কথায় আসিয়া পড়িয়াছি। বলিতে-ছিলাম, ওয়াল্‌তের স্থানটি মনোরম। জনতা কোলাহল দুর্গন্ধ নাই, সমুদ্রের বাতাসে গ্রীষ্মকালের মশা পর্য্যন্ত তিষ্ঠিতে পারে না। পাহাড় ও বন স্থানে স্থানে প্রকৃতির মনোহারী ভাব জাগাইয়া তুলে। নগরের ভিতরে প্রকৃতির দুইটি গম্ভীর বিষয়ের অভাব ঘটে। সেথানে অকূল সমুদ্র বা উচ্চ পর্ব্বত থাকে না। পুরীতে সমুদ্র আছে বটে, কিন্তু পর্ব্বতের গায়ে সমুদ্র নাই। আছে কেবল বালুকা। পাহাড়, বন, সমুদ্র একত্র দেখিতে হইলে ওয়াল্‌তেরে যাইতে হয়। গ্রীষ্ম নাই, কিন্তু সেই জলকষ্ট। মাইল, দুই মাইল দূরস্থিত সমুদ্রের নিকটের কূয়া হইতে সমস্ত জল সংগ্রহ করিতে হয়। তার উপর, ওয়াল্‌তেরে হাট বাজার নাই, দুই মাইল দূরে বিশাখাপত্তনে না গেলে খাদ্যসামগ্রী কিছুই পাওয়া যায় না। একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। তেলেগু শূদ্র ভিন্ন ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যে মৎস্য মাংস ভোজন করেন না।

বিশাখাপত্তনের বিকৃত নাম ভাইজাগ, সংক্ষিপ্ত বলিয়া ঐ নাম চলিত বলিতে হইবে। পূর্ব্বে সমুদ্রতটে না-কি বিশাখেশ্বরীর মন্দির ছিল, এখন তাহা রত্নাকর নিজের গর্ভে টানিয়া লইয়াছেন। বিশাখাদেবীর

নিমিত্ত বিশাখাপত্তন নামের উৎপত্তি। ওয়াল্‌তের হইতে সমুদ্রতট দিয়া বিশাখাপত্তনে যাইতে পাকা পথ আছে; বামে সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ, দক্ষিণে তাল-বন ও নারিকেল গাছ। বস্তুতঃ, দক্ষিণ দেশটাকে এক এক সময় তালগাছের দেশ বলিয়া মনে হয়।

বিশাখাপত্তন শহরটি পরিষ্কার ঝরঝরে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিশাখাপত্তন সুন্দর। রাজপথের গায়ে স্থানে স্থানে অকর্ম্মশিলার উচ্চ পাহাড়, অদূরে সাগর। সমুদ্র-বাতাস সর্ব্বদা বহিতেছে, গ্রীষ্ম নাই। নূতন শিল্পের মধ্যে গজদন্তের, মহিষশৃঙ্গের, চন্দন-কাষ্ঠের সুন্দর বাক্স, ছড়ি, খেলনা প্রভৃতি প্রচুর উৎপন্ন হয়। হাতীর দাঁতের অনুরূপ শাদা হাড়ের নক্সা করা মহিষের শিঙ্গের কাজ অবশ্য তত সুন্দর হয় না। সকল কাজের উপরটা এমন মসৃণ যে কারুকে ধন্য বলিতে হয়। শুনিলাম, বিক্রয় মন্দ হয় না, দেশ-দেশান্তরে যায়, বিলাতের প্রদর্শনীতে পুরস্কার পায়। কিন্তু একটা দেশের শিল্প দুই এক কথায় বলা চলে না।

তেলেগু দেশের সংস্কৃত নাম অন্ধ্র দেশ। একদিন ছিল যখন অন্ধ্রদেশের রাজা ভারতের পুরাণে ও ইতিহাসে খ্যাত হইয়াছিলেন। সে দেশের গঙ্গবংশের এক নৃপতি বঙ্গ পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। সে সময়ের কীর্ত্তিধ্বজা ওড়িষ্যায় অদ্যাপি উড্ডীন হইতেছে। অন্ধ্রের তুলনায় বেদের আর্য্য সেদিনের, অথচ আর্য্য দ্বারা অন্ধ্র অনুপ্রাণিত হইয়াছে।

ফুলের বাগান

ফুল ভালবাসে না, এমন লোক আছে কি? বালক-বৃদ্ধ, সভ্য-অসভ্য সকলেই ফুলের আদর করে। যে ব্যক্তি সঙ্গীতে মুগ্ধ হয় না এক কবি তাঁহাকে দুরাত্মা বিবেচনা করেন। কিন্তু ফুল ভালবাসে না, এমন দুরাত্মা আছে কি?

সে কালের মুনি-ঋষিরা ফুল যত ভালবাসিতেন বোধ হয়, আজকাল আমরা ফুল তত ভালবাসি না, কিংবা ভালবাসিতে জানি না। মুনি-ঋষিরা ঈশ্বর আরাধনাই জীবনের সার ব্রত করিয়াছিলেন; আর ফুল সেই ব্রত সাধনের একটী প্রধান অঙ্গ ছিল। আমরাও ফুল দিয়া দেবদেবীর আরাধনা করি। ফুলের চেয়ে আর যে কিছু সুন্দর নাই!

কণ্ব মুনি নবমালিকা অপেক্ষাও কোমল শকুন্তলাকে নবমালিকার সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন! না জানি তিনি নবমালিকাকে কতই ভালবাসিতেন! শকুন্তলাও তেমনই; সে বকুলের সঙ্গে কথা কহিত; সহকারের সহিত মাধবীর বিবাহ দিত। নবমালিকা তাহার ভগ্নী হইয়াছিল।

যাহা কিছু উৎকৃষ্ট আছে, বলিতে গেলেই ফুলের সুষমা ও সৌরভ মনে আসে। বিকসিত কুসুমের সহিত হাসির তুলনা কোথায় পড়িয়াছি, কিন্তু যিনি শোকাশ্রুতে চাঁপাফুলের উৎপত্তি কল্পনা করিয়াছেন তিনি আরও ধন্য।

কিন্তু সকলে সকল ফুল ভালবাসে না। পুষ্প-বিশেষের প্রতি মনুষ্য-বিশেষের প্রীতির তারতম্য লক্ষিত হয়। কেহ-বা চামেলি, কেহ-বা বেলী, কেহ-বা মাধবী, কেহ-বা রজনীগন্ধাকে অধিক ভালবাসেন। বিস্তৃত ভাল-বাসা যেন ভালবাসাই নহে, নইলে প্রত্যেকের এক একটা সাধের ফুল থাকে কেন?

আজকাল ফুলের বাগান অনেক দেখা যায়। কিন্তু অনেকগুলি বাগান নয়। ফুলের মর্য্যাদা না বুঝিলে বাগান হয় না। দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে বরাহমিহির লিখিয়াছেন, "একস্থান হইতে স্থানান্তরে গাছ প্রতিরোপণ করিবার পূর্ব্বে স্নান ও অনুলেপন দ্বারা শুচি হইয়া তাহার পূজা করিবে।" সেকালের লোকে গাছেকে এমনই যত্ন করিতেন। ফল-ফুল দিয়া তাঁহাদিগকে দেব-দেবীর অর্চ্চনা করিতে হইত।

সাহেবেরা বাগানে যত মন দেন, আমরা তত দিই না। সাহেব-ঘরণী আলবালে স্বহস্তে জল সেচন করিয়া থাকেন, কাঁচি লইয়া স্বহস্তে পুষ্প চয়ন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বালক বালিকার ক্রীড়নকের মধ্যে ভৃঙ্গারাদি উদ্যান-কার্য্যোপযোগী যন্ত্রাদি দেখা যায়।

সেকালের ন্যায় একালেও ধনাঢ্য ব্যক্তির প্রমোদ-বন আছে, গৃহের পার্শ্বস্থ ভূমিখণ্ডে পুষ্প-বাটিকা আছে। সেকালের মতন একালেও সকলে আরাম অন্বেষণ করেন। কিন্তু অধিকাংশ প্রমোদ-বন বন মাত্র। ধনী ব্যক্তির মান-মর্য্যাদা আছে, সুতরাং তাঁহাকে গাড়ী, ঘোড়া, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি সভ্যতা-ব্যঞ্জক বিবিধ উপকরণ রাখিতে হয়। পুষ্প-বাটিকা বা কেলি-কানন না রাখিলেও তাঁহার চলে না। তিনি কিন্তু নর্সরী বা বীজতলা হইতে গাছ কিনিয়া মালীদের হাতে সমর্পণ করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ হইল মনে করেন। গৃহারামাই হউক আর দুরস্থ কেলি-কানন হউক, মালীরা তাহার রচয়িতা, পাতা ও ভোক্তা।

সেকালের লোক পুষ্পোদ্যানকে অন্যভাবে দেখিতেন। দেব-দেবীর পূজার নিমিত্ত পুষ্প-সংগ্রহ আধিকাংশ পুষ্পোদ্যানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এজন্য তাঁহারা বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ নামক শাস্ত্র শিক্ষা করিতেন। বরাহমিহির পাঠে জানা যায় যে, আবশ্যক হইলে তাঁহারা গোমাংস পচাইয়া বৃক্ষ-মূলে সেচন করিতেন; শূকর-মাংস অগ্নিতপ্ত করিয়া গাছে তাহার ধূম লাগাইতেন!

বরাহ ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং এ বিষয়ে তিনি পূর্ব্বাচার্য্যগণের পদ অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র।

পুষ্পবৃক্ষ সম্বন্ধেও সেকালের ও একালের পুষ্পোত্থানে অনেক প্রভেদ দেখা যায়। এজন্য হাজার, দেড় হাজার বৎসরের পুরাতন কথার প্রয়োজন নাই। এখনও নিবিড় পল্লীগ্রামে, যেখানে পশ্চিম দেশীয় সভ্যতার আলোক প্রবেশ করে নাই, এমন দুই একটা পুষ্পোত্থান দেখা যায় যাহার সহিত নাগরিক ধনাঢ্য ব্যক্তির পুষ্পবাটিকা কিংবা প্রমোদোত্থানের তুলনা হয় না। একালের উত্থানে বিলাতী রুচির আধিক্য দেখি, সে কালের উত্থান দেশীয় রুচিতে রচিত হইত।

সেকালের ও একালের উদ্যানে প্রভেদ আছে বলিয়া কোনটীর ভাল-মন্দ বিচার করা যাইতেছে না। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে রুচির পরিবর্ত্তন হয়। বস্তুতঃ ভাল-মন্দ রুচির বিচার সহজ নহে। কেন-না, রুচির সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। সভ্যতার আলোক এবং অসভ্যতার অন্ধকার কখনই এক বস্তু ছিল না বা হইবে না। তবে, কোনটা সভ্যতা এবং কোনটা অসভ্যতা, তৎসম্বন্ধে সকলে এখনও একমত হইতে পারেন নাই।

দেবতার পূজার উপকরণ বলিয়া সে কালের লোকে ফুলের আদর করিতেন। সকল ফুল দেব-দেবীগণ গ্রহণ করেন না। যে ফুলে মধু নাই বা যাহার সৌরভ নাই, সে ফুলের গাছ সেকালের বাগানে স্থান পাইত না। কোন্ ফুল দিয়া কোন্ দেব-দেবীর পূজা করিতে হইবে, তাহা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

সুতরাং অন্য ফুলের গাছে সাধারণের প্রয়োজন থাকিত না। আবার, পরের বাগান হইতে, এমন কি, পরের রোপিত বৃক্ষ হইতে পুষ্প চয়ন করাও শাস্ত্রে প্রায় নিষিদ্ধ আছে। ইহা হইতেই বুঝা যায়, পূর্ব্বে ফুলের বাগান কত ছিল, এবং লোকে তাহার প্রতি কত যত্নবান্ হইত।

একালের ফুলবাগানের উদ্দেশ্য অন্য বিধ। যে ফুলের গাছে সে উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তাহা ছাড়া সে কালের অন্য গাছ বাগানে আজকাল স্থান পায় না। বাস্তবিক, সেকালের ও একালের সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গে যেমন প্রভেদ ঘটিয়াছে, পুষ্পোদ্যান রচনাতেও সেই প্রকার প্রভেদ দেখা যায়।

সেকালের লোকে অতি মিষ্ট লাড্ডুতে রসনা পরিতৃপ্ত করিতেন, একালে ঈষৎ মিষ্ট বা, মিষ্টরসহীন মিষ্টান্নে তাহা চরিতার্থ হইতেছে। সেকালের লোককে একালের অমিষ্ট সন্দেশ দিলে হয়ত তাঁহারা গ্রহণ করিতেন না। অথচ আজকাল দুঃখ এই, ময়রা মিষ্টান্ন অত্যন্ত মিষ্ট করিতেছে। সেকালের রঞ্জিত বা চিত্রিত বস্ত্র আমাদের নিকট অসভ্য মনে হয়, তাহার বর্ণে আমাদের চক্ষুর কোমল নাভী দ্রুত কম্পিত হয়। এজন্য আমরা রঞ্জিত বস্ত্র ত্যাগ করিয়াছি; পরিধেয় শাদা করিয়াছি। যদি কখনও রঞ্জিত বা চিত্রিত বস্ত্র পরিধান করিতে হয়, তাহাও এত ক্ষীণ বর্ণের গ্রহণ করি যে, তাহা চর্ম্মচক্ষুর প্রায় অদৃশ্য হইয়া পড়ে। সেকালের লোকে যে আঘ্রাণকে স্নিগ্ধ মনে করিতেন, আমাদের নিকট তাহা তীব্র বোধ হয়। সেকালের আতর অবিমিশ্র অবস্থায় গ্রহণ করিতে লজ্জা বোধ হয়। সেকালের ধ্রুপদের উচ্চ স্বর-সংযুক্ত গানে আমাদের কর্ণপটহ নিপীড়িত হয়, একালের ক্ষীণ কণ্ঠের টপ্পাই মিষ্ট জ্ঞান করি।

একবার এক ধনাঢ্য ব্যক্তির নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষ-পরিপূর্ণ সুসজ্জিত গৃহবাটিকায় চামেলির গাছ না দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহার উ[illegible] পাই যে, বাসগৃহের নিকটে তীব্র গন্ধ চামেলি প্রীতিকর নহে! বোধ হয়, সভ্যতা আরও কিছু বৃদ্ধি পাইলে আমরা সুগন্ধ ফুল সহ্য করিতে পারিব না।

যাহা হউক, তিনি কখনও জাতী ফুল দেখিয়াছেন কি-না সন্দেহ। কেন-না তাঁহার বাগানে কেবল বিলাতী গাছেরই ছড়াছড়ি দেখিয়াছিলাম। তাঁহার

বাগানে বিলাতী ভাওলেট অতি কষ্টে লালিত-পালিত হইতেছে, এক পাশে 'মেডেন হেয়ার,' কূয়ার গায়ে ও ভিজা কাঁথে যে আগাছা-গুলা জন্মে এক পাশে টবে সেই সকল ফার্ণ। তাঁহার পুষ্পবাটিকায় অর্কিড প্রভৃতি নানাবিধ বিলাতী লতা-পাতার গাছও রহিয়াছে। উদ্যান-কর্ম্মে উদ্যানস্বামীর কিঞ্চিৎ মনোযোগ ছিল, অথচ প্রচলিত কয়েকটা দেশীয় সুসম্পন্ন ফুলের গাছ না দেখিয়া ভয়ে ভয়ে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহার উত্তর পাই, তিনি কলিকাতার কোন 'নর্সরির' গাছের তালিকা দেখিয়া গাছ আনাইয়াছিলেন। বাগানে রাখিবার উপযুক্ত দেশীয় ফুল গাছ কি কি আছে, তাহা তিনি জানেন না। বলা আবশ্যক, নর্সরির গাছের তালিকায় ইংরেজীতে গাছের লাটিন নাম দেওয়া হইয়াছিল, এবং নর্সরির মালিক তালিকায় দেশীয় ফুলগাছের নাম দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই।

বস্তুতঃ, দেখা যায়, যেমন অন্যান্য বিষয়ে আমরা সাহেবী রুচিকে আমাদের রুচি করিয়া লইয়াছি, বাগানের উপযুক্ত গাছ নির্ব্বাচন-সম্বন্ধেও আমরা সেই রুচির অনুসরণ করিতেছি। সাহেবে যে ফুল ভালবাসেন, আমরাও সেই ফুল ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাঁহারা যে গন্ধ মনোহর মনে করেন, আমরাও সেই গন্ধই বাঞ্ছনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি। তাঁহারা 'মিনিয়োনেট' ভালবাসেন, আমাদের ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, সেই নটে-শাকের মত গাছগুলাকে বাগানে স্থান দিতেছি; তাঁহারা 'ক্রোটন' ভালবাসেন, আমরা যেখানে-সেখানে সেই গাছ রোপণ করিতেছি। প্রখর গ্রীষ্মে 'ক্রোটন' হইতে যে বিকট-গন্ধ বাষ্প উদ্গত হয়, তাহা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে আমোদ বোধ করি। জবা করবী প্রভৃতি কয়েকটা গাছ সাহেবেরা বোধ হয় বিচিত্র মনে করিয়া বাগানে রোপণ করিয়া থাকেন, আমরাও ঐ রকম দুই চারিটা দেশীয় গাছ

বাগানে রাখিতে সাহসী হইয়াছি। বিচিত্র-বর্ণ আকুঞ্চিত-পত্র ক্রোটন ও এই-রূপ বিচিত্র-পত্র অন্যান্য বৃক্ষ ও তাল ও কচুবর্গের বৃক্ষেই একালের বাগানের শোভা। এ সকলের দর্শন-যোগ্য ফুল হয় না, এবং ফুলের জন্যও ইহারা আদর পায় না। ইহাদের আদর বাহারে পাতার নিমিত্ত। এই সকল গাছের পরেই গোলাপের রাজত্ব। সকল গোলাপের যে মধুর গন্ধ আছে, তাহাও নহে। কোনটার ঈষৎ সৌরভের নিমিত্ত, কোনটার ছোট বড় অনেক ফুল ফুটিয়া থাকে বলিয়া আদর।

বস্তুতঃ, আমাদের চক্ষু-সুখ-সম্পাদন একালের বাগানের যত লক্ষ্য, ঘ্রাণসুখ-সাধন তত নহে। সেকালের বাগানের গাছের পাতায় কিংবা ফুলে সুগন্ধ পাওয়া যাইত। একালের বাগানের গাছের সে গুণ থাকে না, তাহা নহে; কিন্তু শোভাই প্রধান। এই নিমিত্ত জবা, রাধিকাচূড়া (বিলাতী কৃষ্ণচূড়া), মার্সেল নীল নামক হল্‌দে গোলাপ প্রভৃতি গাছ প্রায় সকল বাগানে দেখি। এখন লতার নিকুঞ্জে বিগনোনিয়া আণ্টিগোনন প্রভৃতি লতাবল্লী সেকালের মাধবী মালতীর স্থান লইয়াছে। পুষ্পাঞ্জলি রচনা করিতে হইলে ফুলের মধ্যে বিচিত্রবর্ণ পত্র না দিলে, মনোনীত হয় না।

আমাদের নর্সরিগুলিও বিলাতী গাছ পালন করিতে পটু হইতেছে, বিলাতী শীত ঋতুর ফুলের বীজ বিক্রয়ে মনোযোগী হইয়াছে, নানাবিধ অর্কিডের অন্বেষণে দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহাতে দোষ নাই বটে, কিন্তু দেশীয় প্রচলিত গাছের উৎকর্ষ-সাধনের দিকে একটু দৃষ্টি পড়িলে আরও ভাল হইত। যে কয়েকটা আমাদের পুরাতন গাছের ফুল বহুদল হইয়াছে, তাহা সাহেবদের যত্নে। সাহেবেরাই আমাদের ভোগ ও বিলাসিতা বাড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহারাই ভারতের অরণ্যের ভিতর হইতে একালের বাগানের অনেক গাছ খুঁজিয়া আনিয়াছেন।

কিন্তু ইহাদের সকল গাছ আমাদের সেকালের লোকদিগের মনে

লাগে না। নাগফণা বা ফেণীমনসা বর্গের গাছগুলা নাকি আমেরিকা হইতে এদেশে আনা হইয়াছে। সেগুলা না আনিলেই ভাল ছিল।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, দেশে বিদেশীয় নূতন নূতন মনোহর গাছের প্রচলনে লাভ বই অলাভ নাই। কিন্তু তা বলিয়া কি দেশীয় প্রচলিত গাছগুলিকে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে? উদ্যান রচনা করিতে জানিলে, শিয়ালকাঁটা ও বাঘভেরেণ্ডা দ্বারাও উদ্যানের শ্রী সম্পাদন করিতে পারা যায়। যেখানে-সেখানে শতাধিক ক্রোটন গাছ বসাইলেই বাগানের সৌন্দর্য্য হয় না। শীতে কঠিনীভূত দেশে যাহাই হউক, এই গ্রীষ্মদগ্ধ দেশে পুষ্পের কান্তি ও মধুর ঘ্রাণ বড় তৃপ্তিকর বোধ হয়। পত্রের শোভা কিঞ্চিৎ খর্ব্ব করিলে আরামগুলি উপভোগ্য হয়।

অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমালিকা, ও নীলোৎপল, এই পাঁচফুলে আমাদের কামদেবের পঞ্চবাণ নির্ম্মিত। বসন্ত-সমাগমে ইহাদের যে শোভা হয়, তাহার তুলনা নাই। গ্রীষ্ম দেশে জলজ পুষ্পের সমাদর না হওয়াই বিচিত্র। কিন্তু কেবল জলজ বলিয়া অরবিন্দ ও নীলোৎপল আদরনীয় নহে। যিনি দূর হইতে সরোবরে বিকসিত পদ্মের সৌরভ পাইয়াছেন, তিনিই ইহার সম্মান বুঝিয়াছেন। বড় দুঃখ হয় কেহ কেহ সভ্যতার এমন উচ্চ সোপানে উঠিয়াছেন যে, পদ্মের পরিমল তাঁহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয় হয় নাই। পঞ্চশরের মধ্যে কোনটিই ছাড়িতে পারা যায় না। বসন্তাগমে অশোকের বর্ণচ্ছটায় বিলাতী সাহেবেরাও মুগ্ধ হইয়া থাকেন। বিলাতী amherstia nobilis রূপের ভাণ্ডার বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু আমূলতো বিদ্রুমরাগতাম্রং সপল্লবাঃ পুষ্পচয়ং দধানাঃ অশোকের নিকটে পরাজয় স্বীকার করে। নবকিসলয়-শোভিত প্রফুল্ল চূত পুষ্পে দিক্ আমোদিত হইবারই কথা। নবমালিকা বোধ হয় মল্লিকা বা কাঠমল্লিকা। এই বনমল্লিকার সুরভির তুলনায় বাগানের মোতিয়া বেলাকেও তুচ্ছ বোধ হয়।

কিন্তু বনে-ঝোপেই নবমালিকার পরিমল অবসান হয়। নীলোৎপলের দশাও তাই। পচাপুকুরে কায়ক্লেশে উহাকে জন্মিতে দেখা যায়। শতদল পদ্মের ন্যায় উহাকেও অল্পায়াসে বহুদল করিতে পারা যায়।

আম-জাম প্রভৃতির ন্যায় তরু, দাড়িম-জবা প্রভৃতির ন্যায় ক্ষুপ, দ্রোণ দোপাটীর ন্যায় শাক, এবং মালতী-দুর্ব্বার ন্যায় লতা, এই চারিভাগে যাবতীয় উদ্ভিদ্ মোটামুটি ভাগ করিতে পারা যায়। এই ভাগানুসারে দেখিলে একটি বৃক্ষ, একটি ক্ষুপ, দুইটি জলজ শাক, ও একটি লতা হইতে কন্দর্প তাঁহার পাঁচটি শর সংগ্রহ করিয়াছেন। চূতের ছায়া, অশোকের কান্তি, পঙ্কজের শৈত্য, নবমল্লিকার আমোদ, সমস্তই বাছিয়া লইয়াছেন। ফুলধনুর জ্যা ভ্রমরময়; কেন না, ভ্রমরের গুঞ্জন নইলে ফুলধনুর টঙ্কার হইত না। বোধ হয়, মাধবীবল্লীর ধনু করিলে আরও সুন্দর হইত। যাহা হউক, পঞ্চ বাণের বর্ণ দেখিতে একটির সিন্দূরের ন্যায় রক্ত, একটির বালারুণের ন্যায় আরক্ত, একটির চম্পকের ন্যায় গৌর, একটির আকাশের ন্যায় নীল এবং একটির দন্ত-পঙ্ক্তির ন্যায় শুভ্র। অতএব কি বৃক্ষের আকারে, কি কান্তিতে, কি পুষ্পগন্ধে, কি রূপে, সকল বিষয়ে মন্মথের পাঁচটি শর বিচিত্র, এবং যদি বসন্তকালের ফুলগুলি হইতে কেবল পাঁচটি ফুল বাছিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে এই কয়েকটি ছাড়া আর কি লইতে পারা যায়?

কালিদাসের সময়ে উদ্যানলতাকে গুণে বনলতা পরাজিত করিয়াছিল। এখনও নবমল্লিকা ও তাহার কুটুম্বিনীগণ গুণে অপরকে পরাজিত করে। জাতীর সুবাস অন্য ফুলে সম্ভবে কি? কুন্দ, যূথী, মল্লিকা, কোন্‌টাই বা পরিত্যাজ্য? সেদিন এক সাহেবী-ভাবাপন্ন ব্যক্তি বিলাতী "যাসমিনের" প্রশংসা করিতেছিলেন। কোন্ ফুলকে বিলাতী যাসমিন্ বলিতেছিলেন, তাহা বুঝিতে পারি নাই। যে ফুলই হউক, তাহা কখনই আমাদের যাসমিনের নিকটেও আসিতে পারিবে না। বিলাতী নামের সকল বস্তুই উপাদেয়

নহে। কৃত্রিম বিষয়ে যাহাই হউক, অকৃত্রিম সৃষ্টিতে বিলাত এ দেশকে হারাইতে পারে নাই। এদেশে মনোজ্ঞ ফুলের অভাব? না মনোজ্ঞ পত্রময় বৃক্ষের অভাব? সূর্য্যের কিরণে যেখানে এত তেজঃ, সেখানের ফুলের সুবাস, ফুলের রূপ, পত্রের কান্তি, বা বৃক্ষের সৌষ্ঠব শীতদেশে সম্ভবে না। যে সকল বিলাতী ফুলের গাছ এদেশে আদর পাইয়াছে, তৎসমুদয়ের অধিকাংশই চীন ও আমেরিকা হইতে আসিয়াছে।

আজকাল অনেকে বিলাতী ফুলের জন্য লালায়িত হইয়া থাকেন। কিন্তু যদি ফুলের বা পাতার বা গাছের শোভার নিমিত্ত ফুলের বাগান করিতে হয়, তাহা হইলে বনে-জঙ্গলে এখানে-ওখানে একটু খুঁজিলে অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে। কূটজ ফুল প্রাচীনদিগকে মোহিত করিত। একালের কোনও উদ্যানে কূটজ রোপিত হইতে দেখি নাই। ইহা এখন অরণ্যে নিজের সুষমা ও সুবাস ছড়াইয়া মরিতেছে। সর্ব্বত্র দেখিতে পাই বলিয়া আমাদের চক্ষে অনেক ফুলের সৌন্দর্য্য লোপ পাইয়াছে। নতুবা তিল, শণ, অতসী, কালমেঘ, লাঙ্গলিকা প্রভৃতি বাগানে বসাইতাম। কদলীর তুল্য সুঠাম বৃক্ষ আর আছে কি? বাগানে বকুল দেখি বটে, কিন্তু চাল্‌তার তুল্য চারু তরু দেখি না। আমাদের দেব-দেবী-প্রিয় অনেক পুষ্প আছে। তৎসমুদায় পরিত্যাজ্য নহে।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, দামী গাছ থাকিলেই বাগান হয় না। রচনায় ও বৃক্ষবিন্যাসেই উদ্যানের প্রাণ। কবির কবিত্বের ন্যায় উদ্যান-রচনাও অপরের নিকট শিক্ষা করিতে পারা যায় না। উহা চিত্রকরের চিত্রের বিষয়-সমাবেশের ন্যায় দুরূহ। ললিতকলার মধ্যে উদ্যান-রচনাকে আনিতে কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু সৌন্দর্য্য-উপভোগই যদি ললিত-কলার সার হয়, তবে উপবনের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা আর কি সৌন্দর্য্য আছে? মানুষের রচিত চিত্রে মন যদি মুগ্ধ হয়, আর প্রকৃতির অনুকরণই যদি

চিত্রকলার পরাকাষ্ঠা হয়, তাহা হইলে উত্থান-রচনা কেমন? মাধবী সহকারকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, একথা পড়িলে যদি আনন্দ হয়, দেখিলে তদপেক্ষা অধিক আনন্দ হইবার কথা। বস্তুতঃ, চিত্রে কেবল একটা ইন্দ্রিয়পথে সৌন্দর্য্যসুখ আনয়নের চেষ্টা হয়; পুষ্পিত উপবনে, সুশীতল ছায়ায়, শ্যামকান্তিতে, সুরভি আঘ্রাণে, বর্ণ বৈচিত্র্যে, কূজন্ত পক্ষি-কাকলীতে সকল ইন্দ্রিয়ই চরিতার্থ হয়।

অনেক বাগানে এমন কৃত্রিম শ্রীসম্পাদনের চেষ্টা দেখা যায় যে, তাহা পূর্ব্বকালের পক্ষযুক্ত সিংহের ন্যায় উৎকট বোধ হয়। উত্থান-রচনা কুশ্রী বা কৃত্রিম হইলে শতমুদ্রা ব্যয় করিলেও তাহা উত্থান হয় না। এক এক উত্থান দেখিলে মনে হয় যেন কতকগুলা গাছ জন্মিতে অন্যত্র স্থান পায় নাই বলিয়া সেগুলাকে বাগানে আনা হইয়াছে। কতকগুলা গাছ রোপণ করাই যেন এক এক উত্থান-রচনার উদ্দেশ্য। চৈত্রমাসে সন্ধ্যার সময় একদিন এক ধনবান্ বিষয়ী ব্যক্তির সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া শুনিলাম, তিনি তৎকালে কয়েকজন বন্ধুর সহিত সম্মুখস্থ পুষ্পবাটিকায় সুখালাপ করিতেছেন। অবিরত বিষয়-কর্ম্মের মধ্যে তাঁহাকে উত্থানসুখ সম্ভোগ করিতে শুনিয়া মনে মনে তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল। নিকটে গিয়া দেখি, তিনি ক্রোটনের এক বনে শয্যা পাতিয়া বসিয়া আছেন! বস্তুতঃ, সেটা বন নহে, কেন না তাহাতে ইতস্ততঃ সোজাসুজি কোণাকোণি সঙ্কীর্ণ পথ রহিয়াছে, এবং আরণ্য বৃক্ষ এক-টীও নাই; সেটা উদ্যানও নহে, কেন না সেখানে তিনি পৃথিবীর ক্রোটন পুরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহার ভোগের উদ্যানটা ক্রোটনের একটা নর্সরি বলিয়া বোধ হইল।

অনেক উদ্যান দেখিলে মনে হয় বুঝি, সেটা গাছ লইয়া শতরঞ্চ খেলি-বার নিমিত্ত রচিত হইয়াছে। কেহ বা বৃত্ত, অর্দ্ধবৃত্ত, ত্রিভুজ প্রভৃতি নানা

আকারে উদ্যানটি ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া ক্ষেত্রতত্ত্ব শিক্ষা দিবার প্রয়াসী হইয়া থাকেন। দেখিলে মনে হয়, সুন্দরী প্রকৃতির বিকৃতি দেখাইবার নিমিত্ত উদ্যান রচনা। এদিকেও প্রকৃতির মধ্যে সরল রেখা কুত্রাপি নাই, এপীঠের সহিত ওপীঠের ঐক্য নাই, হাতের পাঁচটা আঙ্গুল সমান নয়। যিনি মুরারীর আকার ত্রিভঙ্গ করিয়াছিলেন, সৌন্দর্য্য-রসজ্ঞতা তাঁহার অবশ্য ছিল। কুটিলগতি স্রোতস্বতীর সৌন্দর্য্য রুজু খালে কোথায়?

অল্পস্থানের উদ্যানে কৃত্রিমতা প্রকাশিত হইবারই কথা। কিন্তু অট্টালিকা কৃত্রিম বটে, অথচ তাহারও একপ্রকার শোভা আছে। অট্টা-লিকার এপাশে থাম থাকিলে অন্য পাশে থাকে, তাহার এক পাশ দেখিলেই অন্য পাশ ভাবিয়া লইতে পারা যায়। এই হেতু উহার সৌন্দর্য্য প্রাণ-স্পর্শী নহে। অথচ তাহাতেও শ্রীসম্পাদন করিতে পারা যায়। বস্তুতঃ, অল্প স্থানে প্রকৃত উদ্যান-রচনাতেই সৌন্দর্য্যজ্ঞতার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বিস্তৃত স্থানে বহুবিধ বৃক্ষ রোপণ-বৈচিত্র্যে রচনার দোষ কতকটা খণ্ডিত হইতে পারে। কিন্তু বিস্তৃত উদ্যানে যাহা শোভা পায়, ক্ষুদ্র উদ্যানে তাহা উপযোগী নহে। অল্প স্থানের মধ্যেই নিকুঞ্জ, কৃত্রিমশৈল, পুষ্পগৃহ, পক্ষিগৃহ প্রভৃতি পাইতে গেলে সমন্বয়ের অভাব ঘটে। বস্তুতঃ, কোনটাই ঠিক হয় না, অধিকন্তু কৃত্রিমতার উপর কৃত্রিমতা বৃদ্ধি পায়। অল্প স্থানের বাগানের প্রধান দোষ, গাছের সংখ্যাধিক্য। মধ্যে মধ্যে ফাঁক রাখিলে তাহা যেমন বৃক্ষের বৃদ্ধির অনুকূল হয়, তেমনই তদ্দ্বারা উদ্যানের শ্রী সম্পাদিত হয়।

কিন্তু বিস্তীর্ণ স্থানে বাগান করিবার সময়েও সাবধান হওয়া আবশ্যক। আমাদের কৃত কর্ম্মে সহজেই কৃত্রিমতা আসিয়া পড়ে। বাগানের একটী নাম উপবন। অর্থাৎ বাগানটি দেখিলে কতকটা বন মনে পড়িবে। উহা বন নহে; অথবা নর্সরি নহে। উভয়ের সঙ্গতি-সাধনই কঠিন। বহু দ্রব্য

আছে, যদ্দ্বারা অসভ্য বর্ব্বর হইতে সভ্য নাগরিকের চিত্ত অধিক আকৃষ্ট হয়। তরুলতা-জড়িত উচ্চ শৈলমালা, বা ফেণপুঞ্জময় সাগরতরঙ্গ, বা তারকাখচিত নীল আকাশ, এ সব সভ্য-অসভ্য সকলের পক্ষেই গম্ভীর এবং সকলেরই পক্ষে চিত্তের ঐন্দ্রজালিক। প্রতিদিন দেখুন, তথাপি চিত্তের পরিতৃপ্তি হয় না। পর্ব্বতের প্রস্তরে বা তাহার বৃক্ষাদিতে, সাগরের জলে বা তাহার ফেণমালায়, শূন্য আকাশে বা এক এক তারায় সৌন্দর্য্য নাই; অথচ তাহাদের সংযোগে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাব প্রকাশিত হয়। সেইরূপ, সুন্দরীর বর্ণে বা তাহার এক এক অঙ্গে সৌন্দর্য্য নাই; তাহার লাবণ্য বা অঙ্গ-সৌষ্ঠবের প্রশংসা করি বটে, কিন্তু তাহার মুখে তদপেক্ষা অধিক সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই। যে-সৌন্দর্য্যের সীমা করিতে পারা যায় না, যাহা ধরিতে পারা যায় না, তাহাই চিরকাল পরমানন্দকর হইয়া থাকে। এইরূপ, উদ্যানের বৃক্ষবিশেষ, বা তাহার সুবাস বা তাহার বর্ণ দেখিলে চক্ষু পরিতৃপ্ত হইতে পারে। কিন্তু সমুদয় বৃক্ষের বিন্যাসে, প্রত্যেক বৃক্ষের রমণীয় উপাদানের সংযোগে, এমন ভাব প্রকাশের চেষ্টা করা উচিত, যাহাতে পুনঃ পুনঃ দেখিতে ইচ্ছা হয়। স্বাভাবিক বন দেখিলে কি যেন অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদার্থের প্রতিবিম্ব মনে হয়, কি যেন আরও কত কি আছে, এইরূপ ভাবনায় ডুবিয়া যাইতে হয়। ইহাতেই প্রকৃতির মনোহারিণী শক্তি। সাগরজলের তরঙ্গ থাকিয়া থাকিয়া বহিয়া যাইতেছে, যেন তরঙ্গের শেষ নাই। সেইরূপ, প্রকৃত উদ্যানের যেন শেষ নাই, উহার কোনও অংশ প্রধান নয়, অথচ কোন অংশই বাদ দেওয়া যায় না। যেখানে যে গাছটি আছে, ঠিক সেইখানে সেই গাছ না থাকিলে কিছুতেই চলিত না। যে লতা যে তরুকে আশ্রয় করিয়াছে, সে লতা না থাকিলে তরুটির থাকা সার্থক হইত না। যে পথটি বাঁকিয়া গিয়াছে, সে পথটি ঠিক সেইরূপ না বাঁকিলে পথই হইত না।

আর একপ্রকার সৌন্দর্য্য আছে। তাহাকে লৌকিক সৌন্দর্য্য বলা

যাইতে পারে। এই লৌকিক সৌন্দর্য্য দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে রুচির বশবর্ত্তী। অট্টালিকা বা বসন-ভূষণের সৌন্দর্য্য এই প্রকার। যেন কতকগুলি লোক দ্রব্য-বিশেষ বা দ্রব্যের সমাবেশ-বিশেষকে সুন্দর ভাবিবে বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করা থাকে। রুচি-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকার সৌন্দর্য্যের পরিবর্ত্তন ঘটে। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের ছায়া অবলম্বনে ইহার উৎপত্তি হইলেও পরে লোকে ভুলিয়া যায়। কেহ কেহ উদ্যানে প্রস্তরময় অর্দ্ধনগ্ন পুরুষ বা হাবভাবশীলা রমণীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া এই সৌন্দর্য্য-প্রকাশের চেষ্টা করেন। এইরূপ, একই বৃক্ষের একত্র বহুল সমাবেশ দ্বারা এই প্রকার সৌন্দর্য্য হয়। কিন্তু ইহারও সীমা থাকা আবশ্যক। মনে করুন, এক স্থানে কেবল নানাবিধ গোলাপ ফুটিয়া আছে, অন্য স্থানে কেবল বেলা ফুটিয়া রহিয়াছে। এইরূপে উদ্যানের বিভিন্ন স্থানে পুষ্প-বিশেষ প্রস্ফুটিত হইলে একপ্রকার সৌন্দর্য্য প্রকটিত হয়। কিন্তু ইহাতে নূতনতা ও বৈচিত্র্যের অভাব ব্যক্ত হইয়া পড়ে। তবে, এমন কতকগুলি গাছ আছে, যেগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিলে অসঙ্গতি মনে আসে। তাল, হিন্তাল, খর্জ্জুর, নারিকেল, গুবাক, বেত প্রভৃতির একত্র সমাবেশ না দেখিলে কেমন কেমন মনে হয়। বস্তুতঃ, সকল বিষয়ে প্রকৃতির অনুসরণই সহজ পন্থা বলা যাইতে পারে।

উদ্যানের মধ্যে জলাশয়, এবং শ্যামল তৃণক্ষেত্র সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির সবিশেষ সহায়। যেমন বাগানই হউক, তাহাতে শ্যামল তৃণভূমি সুন্দর বোধ হয়। কেন না তাহা শ্যামল। কিন্তু উদ্যান বিস্তৃত হইলে এই তৃণভূমির আকারেও প্রকৃতির অনুকরণ কর্ত্তব্য। বৃত্তাকার বা চতুরস্রাকার না করিয়া উদ্যানের বৃক্ষ-বিন্যাসের উপযোগী করিলে তৃণ-ভূমি দেখিতে রমণীয় হয়। লতা দ্বারা জীবজন্তুর কৃত্রিম আকার দিবার প্রয়াসে হাসি আসে। কারণ জীবজন্তু কদাচ লতা পাতার হয় না। লতাগুলিকে অতিরিক্ত গুল্মিনী হইতে দিলেও ভাল দেখায় না।

আমাদের নীরস প্রাণকে সরস করিতে কাব্য যেমন পটু, উদ্যানকেও তেমনই প্রকৃতির কাব্য মনে করা উচিত। যিনি উদ্যানে কাব্যরস আস্বাদন করিতে পারেন না, প্রকৃতির অনুচর্য্যা তাঁহার বৃথা। যিনি বৃক্ষের পাতায় পাতায় ফুলে ফুলে সঙ্গীতের মনোহারিণী শক্তি অনুভব করিতে না পারেন, তাঁহার উদ্যান-কর্ম্ম নিষ্ফল। এরূপ ব্যক্তি ইন্দ্রের নন্দন-কাননে প্রবেশ করিলেও কেবল কতকগুলা গাছ দেখিতে পাইবেন। যেমন চিত্র দেখিয়া সুখ অনুভব করিতে কিংবা মধুর সঙ্গীতে আত্মহারা হইতে অনুশীলন আবশ্যক, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অনুভব করিতেও তেমনই আবশ্যক। যেমন একটা গান একবার কর্ণে প্রবেশ করিলে কতক দিন পর্য্যন্ত তাহার ঝঙ্কার শুনিতে পাওয়া যায়, তেমনই যে উদ্যানে একবার প্রবেশ করিলে হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠে, অল্পকালে নিবৃত্ত হয় না, সেই উদ্যানই শ্রেষ্ঠ উদ্যান এবং মর্ত্ত্যের নন্দন-কানন। উদ্যান-রচনা কঠিন বই কি! স্রষ্টার পদ অল্প তপস্যায় লাভ করিতে পারা যায় না।

কুষ্মাণ্ড

বর্ষাকালে ওড়িষ্যায় ঘরের চালের শোভা কুমড়া গাছ। ইহাতে চালের অবশ্য ক্ষতি হয়। এক বর্ষার পরেই উহা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু এ দেশের ঘরের কোনও চালই এক বর্ষার অধিক প্রায় টিকে না। চাল ছাউনির দোষে প্রথম বর্ষার জল ঘরের ভিতরে না পড়িলেই সৌভাগ্য মনে করিতে হয়।

ডাঃ রাজেন্দ্রলালের সহিত ফার্গুসন-সাহেব বিস্তর মসী-যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সাহেব বলিতে চান, এ দেশে—এই ভারতখণ্ডে—প্রথমে কাঠের ঘর নির্ম্মিত হইত, এবং তাহারই অনুকরণে পরে পাথরের ও ইটের ঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইতিহাসলেখক হুইলার-সাহেব রামরাজধানী অযোধ্যায় কেবল কাঠের ও বাঁশের বেড়া ও কুড়ে ঘর দেখিতে পাইয়াছেন। প্রাসাদ কাঠের ও বাঁশের বড় বড় ঘর। সে যাহা হউক, ওড়িষ্যার মন্দিরগুলি যেমন কাটা কাটা, ঘরের খড়ের চালগুলিও তেমনি কাটা কাটা, যেন মটকায় উঠিবার এক এক ধাপ। কুষ্মাণ্ডের বিতান না থাকিলেও আরোহণে বড় একটা বিঘ্ন হইত না।

কোন্ কুমড়ার কথা বলিতেছি, তাহা এখনও বলা হয় নাই। এখন একটু নামরহস্য উদ্ভেদ করা আবশ্যক। এই কুষ্মাণ্ড এক; বহুলোকে বহু নাম দিয়া আভিধানিকগণের কার্য্য-বাহুল্য ঘটাইয়াছেন। কিংবা মানবের স্বভাবই এই, প্রিয় বস্তুর একটী নামে তৃপ্ত হয় না। বঙ্গদেশের মধ্যেই ইহা কোথাও 'বিলাতী-কুমড়া' কোথাও 'মিঠে-কুমড়া' বা 'গুড়-কুমড়া,' কোথাও 'সক্করী-কুমড়া' কোথাও 'ডিঙ্গলী বা ডিঙ্গলী-কুমড়া' কোথাও বৈতল ইত্যাদি নামে খ্যাত। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে এই কুষ্মাণ্ড, 'কুমর' নামে

পরিচিত। শাব্দিক পণ্ডিতগণ এই বিবিধ নাম ব্যাখ্যা করিয়া এই বিদেশীয় কুষ্মাণ্ডের ইতিহাস লিখিতে পারেন।

বঙ্গদেশের অনেকে জানেন না যে, পুরীর জগন্নাথ দেবের ভোগের নিমিত্ত, কোন বিলাতী ফল-মূল চলে না। সুখাদ্য সর্ব্ব-জন-পরিচিত বিলাতী-আলু পুরীর মন্দিরে অদ্যাপি প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। তাহার স্থান বাঙ্গালা কচু, ওড়িয়া সারু, অধিকার করিয়া আছে। বিলাতী-আলুর দোষ বিলাতীত্ব। বোধ করি, কালে বিলাতীত্ব ঘুচিয়া যায়। কুমড়া বিলাতী হইলেও ভোগে চলে। এমন কি, বিলাতী কুমড়া না থাকিলে দৈনন্দিন বহুভোগের ব্যঞ্জন কি হইত, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তির গভীর চিন্তার যোগ্য। বিলাতী বলিয়া আলু নিষিদ্ধ; কিন্তু, বিলাতী বলিয়া কাপড় নিষিদ্ধ হয় নাই। আসল কথা, গরজের তুল্য বালাই নাই।

ভোজন-লোলুপ পেটুকের মুখে কুমড়ার ছক্কার প্রশংসা ধরে না। কিন্তু ওড়িয়া ভায়ারাই কুমড়ার যথার্থ আদর জানেন। তাঁহারা বলেন, বৈত-কখারু, মজা কাহিকি পচারু। অর্থাৎ বৈতকখারু বা বিলাতী কুমড়ার মজা তুই কেন পচারিতেছিস্। তাহাত জানাই আছে।

কুমড়ার নামগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায়, 'মিঠে' ও 'গুড়' বিশেষণ-দ্বয় এই কুমড়ার 'মজার' নিদান। বিদেশীয় বলিয়া বিলাতী; তা বলিয়া ইংলণ্ড বা ইউরোপের অন্য কোন দেশ হইতে ইহার আমদানি হয় নাই। ইহার আদি বাস আমেরিকার গ্রীষ্ম দেশ। সুদূর আমেরিকা হইতে আসিবার সময় কুমড়াটী জাহাজে চড়িয়া আসিয়াছিল। সফরে—দেশ ভ্রমণে আসিয়া-ছিল বলিয়া 'সফরী-কুমড়া'; জাহাজে বা বড় নৌকায় আসিয়াছিল বলিয়া 'ডিঙ্গী কুমড়া' 'ডিঙ্গলী' ও 'জাহাজী কুমড়া' নাম হইয়াছে। মেদিনীপুর অঞ্চলে ইহার নাম 'বৈতল'; মেদিনীপুরের সংলগ্ন ওড়িষ্যা দেশে নাম 'বৈতাল' বা 'বৈত-কখারু'। কখারু শব্দটী সংস্কৃত কর্কারু শব্দের অপভ্রংশ।

কর্কারু শব্দের অর্থ কুষ্মাণ্ড। আমরা সংস্কৃত কুষ্মাণ্ড শব্দটী বিকৃত করিয়া কুমড়া করিয়াছি।

মানুষ অলস, ইহার প্রমাণ 'বিলাতী-কুমড়া' নামে প্রকাশ পাইতেছে। সংস্কৃতে যে ফলের নাম কুষ্মাণ্ড, সেটা 'ছাঁচি-কুমড়া'। যখন বিলাতী-কুমড়া এদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহার একটা নূতন নাম না দিয়া বিলাতী বা বৈতল বা জাহাজী প্রভৃতি বিশেষণ যোগ করিয়া পুরাতন কুমড়া নামেই কাজ সমাধা হইল। বিলাতী আলু, বিলাতী কাপড়, বিলাতী দিয়াশলাই প্রভৃতি নামে মানুষের স্বাভাবিক আলস্য প্রকাশ পাইতেছে।

বৈত, বৈতাল নাম লইয়া বড় গোলযোগে পড়িয়াছিলাম। শেষে সাব্যস্ত হইয়াছে, ওড়িয়া বৈত শব্দের চলিত অর্থ বড় নৌকা বা জাহাজ। শব্দটা সংস্কৃত বহিত্র শব্দের অপভ্রংশ। 'বৈত-কথারু' অর্থে জাহাজী কুমড়া, যে কুমড়া এ দেশে ছিল না, যাহা বিদেশ হইতে জাহাজে চড়িয়া এ দেশে আসিয়াছে। কিন্তু শব্দবিৎ পণ্ডিতেরা কোন শব্দের একটী অর্থে তৃপ্ত হন না।

বিলাতী কুমড়া লম্বালম্বী কাটিলে এক এক খানাকে নৌকার মত দেখায়। ডিঙ্গলী-কুমড়া, ওরফে বৈত-কথারু নামের কারণ উহাও বলা যাইতে পারে। বৈতাল শব্দের এই অর্থ অন্যত্র পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বরের মন্দিরের নিকট 'বৈতাল' নামে এক মন্দির আছে। দেউলটির উপরিভাগ দেখিতে নৌকার তলদেশের মত। তবেই, বৈতাল দেউল অর্থে নৌকাকার দেউল। তেমনি 'বৈতাল কুমড়া' অর্থে নৌকাকার কুমড়া করা যাইতে পারে।

আলস্য চিন্তা করিতে দেয় না, নতুবা ছাঁচি ও বিলাতী কুমড়ার মধ্যে বহু বৈসাদৃশ্য দৃষ্ট হইত। দেশী ও বিলাতী কাপড়ের, দেশী ও বিলাতী দিয়াশলাইএর, দেশী ও বিলাতী বেগুনের প্রভেদ এক প্রকার নহে। অজ্ঞানের চক্ষু ও বিজ্ঞানের চক্ষু একই বস্তুকে ভিন্নভাবে দেখে। অজ্ঞানের চক্ষু বস্তু-দ্বয়ের মধ্যে সাদৃশ্য খুজিয়া বেড়ায়, বিজ্ঞানের চক্ষু বৈসাদৃশ্য পরিমাণ করে।

দুইটা রেখা দৈর্ঘ্যে সমান কিনা অজ্ঞান তাহাই বিচার করে; সেই দুই রেখা কতখানি অসমান, বিজ্ঞান তাহার অনুসন্ধান করে। সত্য-নিরূপণের দুই পন্থা; সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য-নিরূপণ। পন্থার গুণে অজ্ঞানে ও বিজ্ঞানে প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে। শিশু এক নামে বহু বস্তুর উল্লেখ করে, প্রৌঢ়-জ্ঞানী আত্মা-পরমাত্মা-জীবাত্মায় প্রভেদ করেন। সাদৃশ্য দেখা আপাততঃ সহজ মনে হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। সর্ব্বজ্ঞ না হইলে দুইটী বস্তু এক বা সদৃশ কিনা, বলিতে পারা যায় না।

সাদৃশ্য তুলনা করিলে দেখা যায়, লাউ কুমড়া শশা কাঁকুড় ফুটি তরমুজ উচ্ছে ঝিঙ্গে পটোল প্রভৃতির মধ্যে জ্ঞাতিত্ব আছে। কেবল যে অঙ্গে-উপাঙ্গে সাদৃশ্য, তাহা নহে। আমাদের দেহের পক্ষে এই সকল ফল অল্পাধিক রেচক। রেচকতা গুণ বীজেই অধিক। বীজে তৈলাংশ আছে। সেই তৈল-হেতু রেচকতা, না বীজের অন্য কোন অংশ হেতু এই গুণ, তাহা নির্ণয়-সাপেক্ষ্য।

অনেক বিষয়ই নির্ণয়-সাপেক্ষ। কুমড়ার জীবনের কয়টা কথা জানা আছে? চাল জুড়িয়া কুমড়া গাছ, তাই দেখি। সবুজ পাতার মাঝে মাঝে হলদে ফুলগুলি কুটীর পর্ণময় বলিয়া প্রাতঃকালে পরিচয় দেয়। কিন্তু এ দেশের লোকগুলা এই নয়নানন্দকর শোভা সন্দর্শন করিতে দেয় না। আমাদের বিশ্বাস, কুমড়ার পাতা ছিড়িয়া পথে ছড়াইয়া দিলে কুমড়া অনেক ফলে। এই বিশ্বাসের মূলে সত্য আছে কি? গাছের পাতার সহিত তাহার জীবনের,—বৃদ্ধি পুষ্টি ও ফলোৎপাদনের—সম্বন্ধ কি? অবশ্য সবুজ পাতাই গাছের রান্নাঘর। সেইখানেই সূর্য্যের আগুনে গাছ চাউল ডাইল চিনি তেল ঘি টক্ ঝাল সমুদয় রাঁধিয়া থাকে। রাঁধা শব্দটা ঠিক হইল না। চাউল ডাইল পাইলে আমরা রাঁধি; গাছ চাউল ডাইল তৈয়ারি করে। এই হিসাবে আমাদের অপেক্ষা গাছের ক্ষমতা অধিক।

সবুজ নূতন পাতাগুলার এই ক্ষমতা ; হল্‌দে পাকা পাতার এই ক্ষমতা নাই। সে পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিলে তাহাদের পান-ভোজনের জোগাড় করিতে হয় না। বর্ব্বর-সমাজে উপার্জ্জন-ক্ষমের আদর, অক্ষমের আদর নাই, অক্ষম ভাল থাইতে বসিতে পায় না। মাটি হইতে যত রস উপরে উঠে, সব্বটুকু নূতন পাতায়, নূতন ডগায়, নূতন ফলের কাজে লাগে। ফলে গাছ বড় হইতে থাকে। কিন্তু ইহাতে আমাদের লাভ কি ? লাভ এই, গাছ লম্বা হইলে পাতার সংখ্যা-বৃদ্ধি, পাতার সংখ্যা অধিক হইলে ফুলের সংখ্যা, এবং ফুলের সংখ্যাধিক্যে ফলের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। ডাঁটা ও পাতার কোণে কোণে ফুল,এবং প্রায় চারিটী বাঁঝা ফুলের পর একটী ফলধারী ফুল। গাছ লম্বা হইলে এই হিসাবে আমাদের লাভ বটে।

কুমড়ার বাঁঝাফুল কি রকমে বাঁঝা ? নেবু ধুতুরা প্রভৃতি অধিকাংশ গাছের প্রত্যেক ফ‍ুলে স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্ব উভয়ই থাকে। কাজেই প্রত্যেক ফ‍ুল হইতে ফল-প্রাপ্তির সম্ভাবনা। কিন্তু কুমড়ার বাঁঝা ফুলে স্ত্রীর ভাগ থাকে না, কেবল পুরুষের ভাগ থাকে। বলা বাহুল্য, পরাগ-কেশর গুলাই পুরুষ। কিন্তু কেশর থাকিলেই পুংস্ত্ব থাকে না। কেশরের পুংস্ত্বই পরাগ। কুমড়ার বাঁঝা ফুলে পরাগপূর্ণ কেশর থাকে। গর্ভাশয় বা বীজাধার থাকে না। অবাঁঝা বা ফলধারী ফুলে স্ত্রীত্ব থাকেই, কেশরও থাকে ; কিন্তু কেশরে পরাগ থাকে না।

কুমড়ার ফুল তবে এক-লিঙ্গ ; হয় পুং, না হয় স্ত্রী। নেবু ফুল দ্বি-লিঙ্গ ; প্রত্যেক ফুল পুং ও স্ত্রী। কুমড়ার জ্ঞাতী পটোল ও তেলাকুচা এ বিষয়ে আরও স্বতন্ত্র। কুমড়ার প্রতি গাছেই পুং ও স্ত্রী ফ‍ুল থাকে, পটোল ও তেলাকুচার কোন গাছে কেবল পুং ফ‍ুল, কোন গাছে কেবল স্ত্রী ফ‍ুল। কুমড়ার ফুল এক-লিঙ্গ, গাছ দ্বি-লিঙ্গ ; পটোল ও তেলাকুচার ফ‍ুল একলিঙ্গ ; গাছও একলিঙ্গ।

পাতার সংখ্যার সহিত গাছের সম্বন্ধ কি? মোটামোটি দেখা যায়, যে গাছ শীঘ্র বড় হইয়া উঠে তাহার পাতা বড় এবং যাহার পাতা বড় তাহার ডাঁটা তত সারাল নয়। কুমড়ার পাতা বড়, জলে পূর্ণ; ডাঁটাও বড়, জলে পূর্ণ। ফলও জলে পূর্ণ। এত জল যাহাকে চাই, তাহা গ্রীষ্মকালে জন্মিতে পারে না। বর্ষাকালই কুমড়ার দিন বটে। রসা মাটি কুমড়ার মাটি বলা যাইতে পারে।

কুমড়ার পাতাগুলা সব সমান হইয়া উপর দিকে থাকে; যেন রোদ পোহাইতে বসে। উদ্ভিদ্-জীবনে পাতার রোদ-পোহান চাইই চাই। জীবন অর্থে শক্তির ক্ষয়। আমার শরীরে যে শক্তি আছে, তদ্দ্বারা ফুস্‌ফুস্, হৃৎ পিণ্ড, পাকাশয় প্রভৃতির ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে। দেহের তাপের ও হস্তপদাদি সঞ্চালনের মূলে সেই শক্তি। এই শক্তির মূল ভুক্ত অন্ন-পেয়। তবে, অন্নাদিতে যে শক্তি ছিল, তাহাই আমি ব্যয় করিতেছি। প্রকৃতির বিধান কঠোর; কেহ কোন যন্ত্র দ্বারা শক্তি সৃষ্টি করিতে পারে না, যাহা আছে, তাহাই ব্যয় করিতে পারে। গাছের জীবন এরূপ নহে। উহা প্রস্তুত অন্ন ভোজন না করিয়া প্রথমে স্বয়ং অন্ন প্রস্তুত করে, পরে সেই অন্ন ভোজন করে। সুতরাং আমাদের মত উহা অন্ন হইতে শক্তি পায় না। অথচ শক্তি ভিন্ন জীবিত থাকিতেও পারে না। সেই শক্তি সূর্য্যের রোদ হইতে পায়। রোদই গাছের জীবনী শক্তির মূল।

গাছের পাতাগুলি উপর দিকে চাহিয়া থাকে কেন? পাতার বোঁটা উপর দিকে না বাঁকিলে পাতা গুলা উপর দিকে থাকিতে পারে না। কিসে বোঁটা গুলাকে উপর দিকে বাঁকায়? বোঁটা বাঁকাইবার কারণও সূর্য্য। বোঁটার যে পাশ রোদের দিকে থাকে; সে পাশ তত বাড়ে না, বিপরীত পাশ বেশী বাড়ে। ফলে বোঁটাটী উপর দিকে বাঁকিয়া উঠে। সকল পাতারই এই নিয়ম। যে গাছের ডাল পাশের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, সে গাছেরও

বোঁটা এমন বাঁকে যে, পাতা গুলার উপরটা আকাশের দিকে থাকে। কুন্দ ফ্‌ুলগাছের জোড়া জোড়া পাতা হয়। ডাল কিন্তু পাশে বা নীচের দিকে হেলিয়া পড়ে। বোঁটাগুলাও তেমনই পাক খাইয়া পাতা-গুলাকে উপর দিকে মেলিয়া রাখে।

অন্যের আশ্রয় না পাইলে দুর্ব্বল বাঁচে না। কর্ষণীগুলা গাছের যেন হাত; কোন কিছু শক্ত জিনিষ ধরিয়া তাহাতে ভর দিয়া দাঁড়াইতে উঠিতে গাছের হাত। আমাদের হাতের আঙ্গুলের মতন কর্ষণীর শাখা আছে। প্রথমে কর্ষণী লম্বা ও সোজা থাকে; কিন্তু খড়-কুটা ঠেকিলে কর্ষণীর আঙ্গুল বাঁকিয়া সেটাকে ধরিতে চেষ্টা করে। তখন মনে হয় যেন, কর্ষণীর চৈতন্য আছে। এইরূপ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর কোন কোন কাজ দেখিলে তাহাদের চৈতন্যের কাজ মনে হয়। কোন কোন জীব আলোর দিকে চলিতে থাকে। আলো-আঁধার বুঝা চৈতন্যের কাজ কি? বিষয়টী দুরূহ, এখন থাক।

কুমড়ার ডগা উপর দিকে থাকে, কিন্তু সবটা থাকে না। অগ্র নীচের দিকে থাকে, পশ্চাতের অংশ উপর দিকে থাকে। কেন এরূপ থাকে? আলোর গুণে, না পৃথিবীর আকর্ষণে? বর্দ্ধিষ্ণু লতার প্রতি উভয়েরই ক্রিয়া আছে। কিন্তু যাহারই ক্রিয়া হউক, এমন পাশে পাশে দুইটী অংশের প্রতি ঠিক বিপরীত ক্রিয়া সহজে বুঝিতে পারা যায় না। তবে বুঝিতেছি, কোমল অগ্র বাঁকিয়া নিম্নমুখী হইয়া ভালই করিয়াছে। উপর দিকে বিপদ্ আছে, প্রখর রোদ, প্রবল বর্ষা কোমল দেহে সহজে সহে না।

গাছের মূল সব নীচের দিকে যায়, যেন মাটিতে প্রবেশ করিতে চায়। সকল গাছেরই মূল নীচের দিকে মাটির ভিতরে যাইতে চায়, কাণ্ড উপর দিকে উঠে। অবশ্য কোন কারণ থাকিবে। একটা কারণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ; ফলে মূলগুলা টান পাইয়া মাটিতে প্রবেশ করে। কিন্তু

শিকড়ে ও ডগায় এমন প্রভেদ ঘটে কেন? নইলে নয়, বটে; কি হেতু নয়?

বীজটা কত টুকু! লম্বা চালজোড়া গাছের তুলনায় কত টুকু! সেই ছোট বীজই বাহিরের জিনিষ ভিতরে পূরিয়া বড় হইয়াছে। আশ্চর্য্যের কথা বটে। কিন্তু আরও আশ্চর্য্য আছে। থলিতে খোলা পূরিলে খোলা টাকা হয় না। খোলার বদলে অন্য কিছু পূরিলে সে গুলাও টাকা হয় না। থলির ভিতরে টাকা না দিলে টাকা পাওয়া যায় না। কিন্তু গাছটা মাটির রস ও বাহিরের বায়ু ভিতরে টানিয়া নিজের শরীর গড়িতেছে। কোথায় মাটি জল বায়ু, আর কোথায় পাতা-ডাঁটা-ফুল-ফল-বীজ! যেখানে যেমনটী হইয়া থাকে সেখানে ঠিক তেমনটী। ফলের জায়গায় ভুলিয়া মূল হয় না। কিংবা নিজের পাতার বদলে উচ্ছেপাতা হয় না।

কয়টা কারণ জানা গিয়াছে? পাতার রং সবুজ, ফুলের রং হলদে। ফলের রং প্রথমে সবুজ, ক্রমশঃ হলদে, শেষে গেরি। পাতাতেই বা কেন সবুজ রং, ফুলেতেই বা কেন হলদে রং? লাল নীল বেগুনে হলদে শাদা প্রভৃতি সকল রঙ্গের ফুল দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কাল রঙ্গের ফুল কই, কিংবা সবুজ রঙ্গের ফুল কই? কখন কখন বাগানের শাদা মল্লিকা ও লাল গোলাপ ফুলের বদলে সবুজ ফুল হয়, যেন সবুজ পাতা। কিন্তু গাছে নিজের স্বভাব ভুলিয়া যায়, ফুল গড়িতে গিয়া পাতা গড়ে। ফুলের জায়গায় থাকে বলিয়া পাতাগুলা ফুল নয়।

কুমড়া পাতায় শক্ত শক্ত লোম আছে। লাউ ও কুমড়া শাকে কত প্রভেদ! লাউ-শাকেও লোম আছে, লোমগুলা তুলার মত কোমল। এ প্রকার পার্থক্যের উদ্দেশ্য কি? গরু বাছুর হইতে আত্মরক্ষা? তাহা হইলে লাউ-শাক লোম সত্ত্বেও শস্ত্রহীন, কুমড়া-শাক তদপেক্ষা কিছু ভাল। কেবল গরু-বাছুর হইতে আত্মরক্ষা নয়। কত পোকা পিপড়া শত্রু আছে।

লোমের মাঝ দিয়া এই সব শত্রুর যাতায়াত সোজা হয় না। কুমড়ার জ্ঞাতিবর্গ তিক্ত রস দ্বারা আত্মরক্ষা করে।

শৈশবাস্থায় কেহই আত্মরক্ষায় সমর্থ নহে। শাবক অবস্থায় মৃত্যু অধিক। শিশু বহু, যুবক অল্প। তাই, কুমড়ার বীজ এত অধিক। দশটা মরিলেও আর দশটা বাঁচিবে। এই আশা।

ফলের ভিতরে বীজগুলা থাকে। কুমড়া পাকিয়া মাটিতে পড়ে। সেখানে ফলের খোলাটা পচিয়া যায়, বীজগুলা মাটি দেখিতে পায়। কিন্তু বীজগুলা একই জায়গায় পুঞ্জীকৃত হইয়া থাকে। ইহাতে লাভ কি? আমরা নাকি ঘর বড় ভালবাসি; যেখানে জন্মি পুরুষানুক্রমে সেই থানে ঘরকন্না করি, পরিজন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যত্র গিয়া বাস করিতে চাই না। ফলে এই হয় যে, এক হাত ভূপৃষ্ঠের নিমিত্ত মামলা মোকদ্দমা মারা-মারি কাটা-কাটি করিয়া মরি। কুমড়ার চারাগুলারও সেই দশা হয়। যেটি তেজী অপর সকলকে হারাইয়া সেটি নিজে বড় হইতে থাকে, শেষে নিজের তেজী সন্তান রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করে। তবে ইহাদের মধ্যে ভ্রাতৃ-প্রণয় নাই। কাহারই বা আছে? মুখে বলি মানুষ মাত্রেই ভাই-ভাই। কিন্তু কাজে? মানুষের তুল্য হিংস্র শত্রু মানুষের আর নাই!

কুমড়া কিন্তু দূরদর্শী। নিজের বীজের সঙ্গে, ফলের শাঁসে গুড় মিশাইয়া রাখে। তাহার লোভে মানুষ বানর ও নানা পাখী পাকা কুমড়া খাইতে আসে! বীজ খায় না, এখানে ওখানে নিকটে দূরে ছড়ায়, শাঁস খাইয়া কুমড়ার ছেলে পিলে দূরে দূরে রাখিয়া যায়। বীজ খাইবার জো নাই, তাহাতে বিষ আছে। কৃষি-গুণে বিষ কমিয়া গিয়াছে,—বন্য দশায় অধিক ছিল। ইহার সাক্ষী কুমড়ার জ্ঞাতি মাথাল ফল। কুমড়া অপেক্ষা শিমুল আরও দূরদর্শী। ফল পাকিলে ফাটিয়া গাছেই থাকে, আর বীজ-গুলা লোম (তুলা) রূপ পাখা দ্বারা বাতাসে উড়িয়া দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়ে। ফলে,

ভাইতে ভাইতে ঝগড়া করিতে হয় না। যাহাদের সন্তান নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ে, তাহাদের সবংশে ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু তৎসঙ্গে আত্মরক্ষার উপযুক্ত গুণ থাকা চাই। দুর্ব্বল জীবের একত্র বাস করাই শ্রেয়ঃ; সবলের পক্ষে কোন নিয়ম নাই। বাড়ীর কুমড়া এখন দুর্ব্বল; আমরা রক্ষা না করিলে বাঁচে না।

ধূলা

যাঁহারা শহরে বাস করেন, সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে ধূলার জন্য অস্থির হইতে হয়। পবন ধূলির সহায়; পবনবাহনে পথ-ঘাট-বাট হইতে ধূলি আসিয়া নির্জ্জন-সজন নির্ব্বাত-সবাত সকল স্থানে, গৃহের ভিতরে, কোণে সর্ব্বত্র বিচরণ করে। যেখানেই পবনের সঞ্চার, সেখানেই ধূলার সঞ্চারও অব্যাহত। কেবল উর্দ্ধদিকে নয়; কারণ বায়ু অপেক্ষা ধূলি বহুগুণ ভারী। বন্যার জলে যেমন কাদা-বালি ভাসিয়া আসে, তেমনই বায়ুতে ধূলা ভাসিয়া বেড়ায়। বন্যার জলের স্রোত বন্ধ হইলে কাদা-বালি নীচে থিতাইয়া পড়ে, নির্ব্বাত রুদ্ধ স্থলে ধূলাও তেমনই নীচে থিতাইয়া পড়ে।

স্থূল ধূলা পড়ে, সূক্ষ্ম ধূলা একমাস দুই মাসেও থিতাইয়া পড়ে না। ধূলা এত সূক্ষ্ম হইতে পারে যে, শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। স্থূল ও সূক্ষ্ম কথার কথা মাত্র। সূক্ষ্ম অপেক্ষা সূক্ষ্ম আছে, তাহা অপেক্ষা আছে। তাহা অপেক্ষাও আছে। অণুতে পঁহুছিলে সূক্ষ্মত্বের শেষ। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই এত সূক্ষ্ম ধূলা আছে যে, কল্পনাও চমকিত হয়। ঘষা পয়সা কেহ বসিয়া বসিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া ঘষা করে নাই। একহাত, দুই হাত, দশ হাত, শত হাত ঘুরিতে ঘুরিতে ঘষা হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেকের হাতের স্পর্শে পয়সার ধূলা বা চূর্ণ উঠিয়া গিয়াছে। সে চূর্ণ দেখিবার নহে, মাপিবার নহে। কলিকাতার শহরের ধূলায় কি যে নাই, তাহা বলা যায় না। কেবল পথের পাথর ক্ষয় পায় তাহা নহে; ট্রামগাড়ীর লোহার রেল, ঘোড়া ও গরুর গাড়ীর চাকার বেড়, পায়ের জুতার চামড়া, লোহার কাঁটা, কাষ্ঠ, কাপড়, সোনা, রূপা, টিন, কাগজ, কাচ, মাটি প্রভৃতি যাহা কিছু লোকে নাড়িতেছে, তাহারই

সূক্ষ্ম অংশ বায়ুতে মিশিয়া যাইতেছে। ধূলা যদি না থাকিত, ঘর-দুয়ার, কাপড়-চোপড়, বাসন-কোসন, বইপত্র পরিষ্কার রাখিতে চিন্তা করিতে হইত না। শহর বলিয়া নহে, দূরবর্ত্তী গ্রামেও ধূলা। অন্ধকার ঘরে রোদ ঢুকিলেই বুঝি কোটি কোটি ধূলা সঞ্চালিত হইতেছে।

ধূলা লইয়া অনুবীক্ষণে দেখিলে নানাবিধ দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলিকে দুইভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। কতকগুলির সহিত কোন জীবের সম্পর্ক ছিল না, অপর কতকগুলির সহিত ছিল এবং আছে। প্রথম গুলিকে আজৈব, দ্বিতীয় গুলিকে জৈব বলা যায়।

আজৈব ধূলির মধ্যে মাটি ও বালি। কলিকাতা শহরের কাল পাথরিয়া ধূলা, বর্দ্ধমানের লাল ইটের ধূলা, যেমনই হউক ধূলা। বালি কিছু বড়। ধূলা কিছু ছোট ; কিন্তু সরু বালিও ধূলা।

জৈব ধূলার মধ্যে পুষ্পের পরাগ, ছত্রাক বর্গের উদ্ভিদের রেণু, বাকটিরিয়া বাসিলি নামক অণুজীব, কৃমিকীটের ডিম্ব, সূত্র, কার্পাস প্রভৃতির ছিন্ন আঁশ ; এইরূপ অনেক পদার্থ ধূলার আকারে বায়ুতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

'কাল বৈশাখীর' প্রবল ঝটিকার সময় মনে হয় দেশের ধূলা আর রহিল না। রাজপুতানা ও পঞ্জাবে সে সময় ধূলার ছোট খাট ঝড় বহিতে থাকে। ধূলা যত সরু, ততই অসহ্য হয়। বর্ষা কালে এবং বর্ষার অবসানে কিছুদিন বায়ু নির্ম্মল থাকে, তাই শরতের নীল আকাশ, প্রখর রৌদ্র, দীপ্ততারা অন্য সময়ে অপ্রাপ্য। নির্ব্বাত দিনে ধূলার জ্বালা তত ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু মধ্য-এসিয়াতে নির্ব্বাত দিনেও নিস্তার নাই। সেখানে দিবা দ্বিপ্রহরে প্রদীপের আলো ব্যতীত বই পড়া না কি অসম্ভব ; সেখানে ধূলার এতই জ্বালা।

সমুদ্রের নিকটেও ধূলার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। সেখানকার ধূলা বালি বটে ; কিন্তু ধূলা ও বালির প্রভেদ অল্প। বিস্তৃত নদীর বালি,

সমুদ্রের তটের বালি বাতাসে বহিয়া আনিয়া মেদিনীপুর ও ওড়িষ্যার স্থানে স্থানে পাহাড় করিয়া তুলিয়াছে। রাজপুতানার মরুস্থলীর বালুকা, স্থানে স্থানে পাহাড়ের আকার ধারণ করিয়াছে। পুরীর সমুদ্র-তটস্থিত এক একটা মঠ বালির প্রাচীরে বেষ্টিত হইয়াছে। দুই এক বৎসর বালিকে রাজত্ব করিতে দিলে মঠগুলি অদৃশ্য হইয়া পড়িত।

পথ-ঘাট-মাঠ, গ্রাম-নগর, পাহাড়-পর্ব্বত, অবিরত ক্ষয় পাইতেছে; উপরে ধূলির স্তর জন্মিতেছে। কিন্তু ইহাই ধূলির একমাত্র কারণ নহে। আগ্নেয় গিরির উৎক্ষেপের সময় ভূ-নিম্নস্থ পদার্থ ধূলির আকারে উদ্গীর্ণ হয়। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই এই উৎক্ষিপ্ত ধূলির পরিমাণের আভাস পাওয়া যাইবে। গত ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সাণ্ডাদ্বীপস্থ ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরির এক ভয়ঙ্কর উৎক্ষেপ হয়। তাহাতে সেই দ্বীপের দুই-তৃতীয়াংশ উৎসন্ন হইয়াছিল। তাহার মৃত্তিকা ও উৎক্ষিপ্ত পাংশু দ্বারা চারি পাশের সমুদ্র এতদূর আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, সেখানে জাহাজ গমনা-গমন অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রাকাতোয়ার এক অংশ ছিন্ন হইয়া ধূলির আকারে বায়ুতে ভাসিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছিল। লোহিত সান্ধ্য-আকাশ সে বৎসর ও পর বৎসর শরৎ ও শিশিরকালে শুধু এদেশের নয়, বহু দূরস্থ ইয়ুরোপের ও আমেরিকার লোকের নানাবিধ জল্পনার কারণ হইয়াছিল।

সমুদ্রের নিকটে দাঁড়াইলে কিয়ৎক্ষণ পরে গায়ে মুখে লবণাস্বাদ পাওয়া যায়। তরঙ্গের উৎক্ষেপে জলকণা ভাঙ্গিয়া যায়; বাষ্পাকারে জল আবহের সহিত মিশিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে জলের লবণ সূক্ষ্ম কণার আকারে আবহের ধূলির পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এইরূপ সমুদ্রজল, নদীজল, আর্দ্রভূমি শুখাইবার সময় বাষ্পের সঙ্গে সঙ্গে ধূলিও বায়ুতে আসিয়া মেশে।

অজৈব ধূলির এই তিন পার্থিব উৎপত্তি ব্যতীত দিব্য উৎপত্তি আছে।

অন্ধকার রাত্রে কে না উল্কাপাত দেখিয়াছেন ? এক এক সময় শিলাবৃষ্টির মত ঝাঁকে ঝাঁকে উল্কা পড়িতে থাকে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, এক অহোরাত্রের মধ্যে ন্যূনাধিক দুইকোটি উল্কা দিব্য প্রদেশ হইতে পৃথিবীতে পতিত হইতেছে। অধিকাংশই ক্ষুদ্র মটর কলায়ের মত। ভীষণ বেগে পৃথিবীর দিকে আসিতে আসিতে তৎসমুদয় আবহের ঘর্ষণে উত্তপ্ত ও দীপ্ত হইয়া উঠে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাষ্প সূক্ষ্ম ধূলির আকারে আবহের সহিত মিশিতে থাকে। সাইবিরিয়ার ন্যায় তুষারাচ্ছন্ন প্রদেশে দিব্য ধূলি পড়িয়া মাটি হয়, তাহাতে ছোট ছোট উদ্ভিদ্ জন্মে। শিলাবৃষ্টির শিলা গলিয়া গেলে ও সে জল শুখাইলে যৎসামান্য ধূলি থাকে। তাহা দিব্য ধূলি।

কলিকাতার মত শহরে, যেখানে সহস্র চুল্লী হইতে দিবারাত্র ধূম নির্গত হইতেছে, না জানি কত ধূলি বায়ুতে গিয়া মিশিতেছে! কাঠ-কয়লা-তেল-বাতি পুড়িবার সময় কত ধূলির সৃষ্টি হইতেছে। ধূম্রপায়ীর প্রতিধূমোদ্গারে কোটি কোটি ধূলিকণা বায়ুর উপাদান বৃদ্ধি করিতে থাকে।

জৈব ধূলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতে গেলেও একখানি বই লিখিতে হয়। ধানের মাঠে কত অসংখ্য পরাগ মাঠে মাঠে বায়ুতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এক এক সময় এক একটা জঙ্গলে ঢুকিলে পরাগ মাখিয়া বাহিরে আসিতে হয়। কল্য যেখানে ছত্রাক দেখি নাই, আজি সেই পচা খড়ের চালে, গোবরের গাদায় ছোট বড় কত ছাতু উদ্গত হইয়াছে। মধু সাবধানে রাখিলেও পরে অম্ল হইয়া উঠে; কলসী পোড়াইয়া কত যত্নে খেজুররস ধরা হয়, দুই এক ঘণ্টার মধ্যে তাহার মিষ্টতায় মাদকতা-শক্তি আসিয়া জুটে; দুগ্ধ, অন্ন-ব্যঞ্জন কিছুই রাখিবার জো নাই, কোথা হইতে কি ধূলা আসিয়া তৎসমুদয় বিকৃত করিয়া দেয়। যক্ষ্মা-রোগীর শ্লেষ্মা ভূমিতে শুখাইয়া গিয়াছে; ধূলির আকারে বায়ুতে ভাসিতে ভাসিতে অন্যান্য লোকের ত্রাস জন্মাইতে থাকে। এমন কি, বোম্বাই-

প্লেগের আদি বীজের নাকি ধূলির সহিত সদ্ভাব। এইরূপ কত অণুজীব যে ধূলির আকারে ভাসিতেছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে বরাহাচার্য্য জালান্তর (জানালা) পথে অন্ধকার গৃহের বায়ুর ধূলিকণা দেখিবার কথা লিখিয়া গিয়াছেন। সেই ধূলির নাম রজঃ রাখিয়াছিলেন। তত প্রাচীন কালেও আবহের রজোবৃদ্ধি ভয়ের কারণ হইয়াছিল। সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের সময়ে আকাশ লোহিত বর্ণ হইলে প্রাচীনেরা তাহাকে দিগ্‌দাহ বলিতেন। "সন্ধ্যারজঃ বন্ধুকপুষ্পতুল্য অতি রক্তবর্ণ কিংবা অঞ্জনতুল্য অতি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উদয়াস্তকালে সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিলে প্রজা পীড়িত হয়; কিন্তু শুক্লবর্ণ রজঃ লোকের বৃদ্ধি ও শান্তি করে।" "যে দিগ্‌দাহের সময় আকাশ নির্ম্মল ও নক্ষত্র সমুদয় বিমল দেখায়, দক্ষিণ বায়ু বহিতে থাকে, এবং যে দিগ্‌দাহের বর্ণ সুবর্ণের তুল্য ও স্বচ্ছ, তাহাতে লোকের হিত হয়।" ইত্যাদি।

যদি বায়ু ধূলিশূন্য হইত, তাহা হইলে আকাশ কৃষ্ণবণ দেখাইত, গৃহের এক পার্শ্বে গাঢ় অন্ধকার, অন্য পার্শ্বে প্রখর দীপ্তি হইত। পরিষ্কার আকাশের নীলবর্ণের কারণ বায়ুর ধূলি বলিয়া বোধ হয়। অক্‌সিজেন গেস সূর্য্য কিরণ শোষণ করিতে পারে, বায়ুতে অক্সিজেন আছে। তাই বোধহয় আকাশের নীলবর্ণের কারণের মধ্যে অক্সিজেনের বর্ণও আছে। সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ের সময়ে আকাশ রক্তবর্ণ দেখাইবার কারণও বায়ুর ধূলি। এই হেতু ক্রাকাতোয়ার উৎক্ষেপের পর কয়েক মাস পর্য্যন্ত সূর্য্যোদয়াস্ত-সময়ে দিগ্‌দাহ হইত। অন্ধকারগৃহে সূর্য্যরশ্মি বা তড়িতের আলোকের তীক্ষ্ণ কিরণ প্রবেশ করিলে বায়ুর রজঃ-সমূহ আলোকিত হয়। তেমনই আবহের উপরিভাগস্থ ধূলিকণার উপর সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হওয়াতে ঊষার আলোর উৎপত্তি।

ঐট্‌কিন সাহেব দেখাইয়াছেন যে কুয়াশার সময় এক এক ধূলিকণার গায়ে জলীয় বাষ্প জমিবার সুবিধা পায়। আর্দ্র বায়ুর জলীয় বাষ্প টানিয়া

জলকণায় পরিণত করিবার পক্ষে এই ধূলিকণার প্রয়োজন। ধূলিশূন্য বায়ু আর্দ্র করিলেও তাহাতে মেঘ বা কুয়াশার উৎপত্তি হয় না, কিন্তু সেই বায়ুতে ধূম নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ উৎপত্তি হয়। তড়িৎ-প্রভাবে মেঘের সৃষ্টি হইতে পারে, এবং হইয়া থাকে বটে, কিন্তু কলিকাতার মত শহরের কুয়াশার দীর্ঘ স্থিতি দেখিলে ধূলিকণার কার্য্য বেশ বুঝিতে পারা যায়।

ঐট্‌কিন সাহেবেই প্রথমে নৈসর্গিক ব্যাপারে ধূলির প্রয়োজন বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বায়ুর ধূলি গণিবার যন্ত্রও উদ্‌ভাবন করিয়াছেন। তাঁহার গণনা হইতে জানা যায়, নগরের এক ঘন ইঞ্চি বায়ুতে কোটি কোটি ধূলিকণা বিদ্যমান, গ্রামের অপেক্ষাকৃত পবিত্র বায়ুতেও সহস্র সহস্র বা শত শত ধূলি-কণা থাকে। উচ্চ পর্ব্বতের উপরিভাগে ধূলির সংখ্যা নিতান্ত কম। এই নিমিত্ত ফুস্‌ফুসের রোগে পতিত ব্যক্তির চিকিৎসার নিমিত্ত পাহাড়ের উপরে চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করা হইতেছে।

আবহের রজঃ দূরবর্ত্তী বৃক্ষাদি দেখিবার অন্তরায়। এক এক সময়ে আবহ এমন নির্ম্মল হয় যে এক মাইল দেড় মাইল দূরস্থ বৃক্ষাদি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, আবার অন্য সময়ে সেই সকল বৃক্ষ অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। যাঁহারা দূরবীক্ষণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা আবহের বিড়ম্বনা বেশ উপলব্ধি করিয়া থাকেন। তাই পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদেরা নিম্নবায়ুর রজঃ ত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে উচ্চ পর্ব্বতে মান-মন্দির করিতেছেন।

খণ্ডগিরি

(১)

"এই কি সেই খণ্ডগিরি? এইখানেই কি অর্হৎগণ সংসারে বীতরাগ হইয়া নির্ব্বাণের পথ অন্বেষণ করিয়াছিলেন? এইখানেই কি রাজেন্দ্রগণ বৌদ্ধ ও জৈন যতিগণের ধ্যান, ধারণা ও সমাধির নিমিত্ত গিরিদেহ খোদিত করাইয়াছিলেন?"

পশ্চিমগগনে নানা রঙ্গ ছড়াইয়া ভানু ক্রমশঃ নিম্নগামী হইতেছেন। অপক্ক ধান্যের শ্যামল আবরণে বিস্তীর্ণ বসুন্ধরা স্বীয় কলেবর মণ্ডিত করিয়াছেন। পূর্ব্বদিকে দেবাদিদেব ভুবনেশ্বরের তুঙ্গ মন্দিরচূড়া নয়নে অস্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে। সন্ধ্যা-সমাগমে সমুদ্র-সমীর ক্লান্ত শরীর স্নিগ্ধ করিতেছে। লোকালয়ের কোলাহল নাই, সংসারের আকুলতা নাই, চারিদিক্ নিস্তব্ধ।

শরৎকাল। একদিন অপরাহ্নে আমরা ওড়িষ্যার খণ্ডগিরি দেখিতে আসিয়াছিলাম। তথায় পাষাণময় গুম্ফা (খোদিত গৃহ) দেখিয়া আসিয়া উদয়গিরির উপরে ক্লান্তদেহে উপবিষ্ট। সম্মুখে ও নীচে "রাজারাণী গুম্ফা" নামক গিরিদেহ-খোদিত পাষাণময় দ্বিতল গৃহশ্রেণী।

হয়-ত বাহ্যপ্রকৃতি আমাদের চিন্তাস্রোত নূতন মার্গে চালিত করে, হয়-ত আমাদের মনই প্রকৃতিকে ইচ্ছানুরূপ বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া আপনার সহচরী করিয়া লয়। কোথায় সেই প্রাচীন বৌদ্ধ, আর কোথায় আমরা! প্রায় দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে বৌদ্ধকীর্ত্তি প্রথিত হইয়াছিল; সামীপ্যগুণে আজ

আমরা সেই কালের অন্তর্ভূক্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা নীরবে সেই পুরাতন কালের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিলাম, যেন সে কাল এখনও আছে, যেন সেই সকল গিরিগুহা এখনও ভিক্ষুগণে পরিপূর্ণ, যেন আমরা তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করিতেছি।

খণ্ডগিরির সম্মুখে পূর্ব্বদিকে কয়েকটা আম্র বৃক্ষ। এখানে সেখানে কয়েকটা বট ও অশ্বথ। কিঞ্চিৎ দূরে কুচিলা ও অন্যান্য বন্য বৃক্ষ। একটা অশ্বথবৃক্ষে বানরের আকস্মিক চীৎকারে আমাদের চিন্তাস্রোত প্রতিহত হইল। আমার বন্ধু বলিলেন, "চলুন, তৃতীয়ার চাঁদ ডোব ডোব হইতেছে। এখানে হিংস্র জন্তুর অসদ্ভাব নাই।" বাস্তবিক, সেই প্রাচীন যতিগণের পুরাতন আবাস এখন হিংস্র জন্তুর আবাস হইয়াছে। পাষাণময় বলিয়াই এখনও টিকিয়া আছে, গিরিশেখর বলিয়াই এখনও স্তূপে পরিণত হয় নাই।

কিন্তু পাষাণও কালের হাত এড়াইতে পারে নাই। স্থানে স্থানে গুম্ফা ভগ্ন হইয়াছে, স্থানে স্থানে শিলা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ বন্য বৃক্ষে গৃহ ও প্রাঙ্গণ আচ্ছাদিত হইয়াছে। দুই এক উচ্চ স্থান ব্যতীত সমুদয় গিরিদেহ তৃণগুল্মবৃক্ষে আবৃত হইয়াছে।

গিরিদেহে সোপান নাই। কেহ কেহ প্রাচীন আর্য্যগাথা শুনিতে সে সকল স্থানে বিচরণ করে বলিয়া, লতাপাতার ভিতর দিয়া একটা অস্পষ্ট পথ পড়িয়াছে।

অন্ধকার রাত্রি সমাগত দেখিয়া আমরা আর অধিকক্ষণ তথায় থাকিতে পারিলাম না। লতাপাতার ভিতর দিয়া গাছের ডালপালা বাঁকাইয়া আমরা উদয়গিরির শেখর হইতে নিঃশব্দে অবতরণ করিতে লাগিলাম।

আমার বন্ধুর সহধর্ম্মিণী আমাদের সঙ্গিনী হইবার অভিলাষে পাহাড়ের কিয়দ্দূর উঠিয়াছিলেন। লতাপাতায় পথ আচ্ছন্ন, স্থানে স্থানে বিশ্লিষ্ট শিলা পতনোন্মুখ দেখিয়া তিনি কিয়দ্দূর উঠিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

উদয়গিরির পাদদেশে এক বৈষ্ণবের কুটীর আছে। তাঁহার কুটীরে বন্ধু-গেহিনী আশ্রয় লইয়াছিলেন।

গৃহের এক পার্শ্বে এক ক্ষীণ প্রদীপ মিট্-মিট্ করিতেছিল। দেশ-দেশান্তরের নানা ভক্ত ও যোগি-সন্ন্যাসীর কাষ্ঠ-পাদুকা-শ্রেণীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বৈষ্ণব-ঠাকুর ইতিহাস বর্ণনা করিতেছিলেন। কাষ্ঠময় পাদুকার বিচিত্র রচনা ও তদুপরি চন্দনলেপ দেখিয়া বুঝিলাম যে, তৎসমুদয়ের অধিকারী নানাদেশীয় সন্ন্যাসী ছিলেন, এবং তাঁহাদের প্রতি বৈষ্ণবঠাকুরের অচলা ভক্তি। বৈষ্ণবঠাকুর শুভ্র শ্মশ্রুতে হস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে পাদুকা-কাহিনী ব্যাখ্যা করিতেছিলেন; অদূরে সসম্ভ্রমে অবনতমস্তকে বন্ধু-গেহিনী শুনিতেছিলেন।

আরতির সময় অতীতপ্রায় দেখিয়া বৈষ্ণবঠাকুর আমাদিগকে পরদিন আসিতে বলিলেন। আমরাও সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম। এতক্ষণ আমাদের মধ্যে কোন কথা হয় নাই। কি যেন গাম্ভীর্য্যে, কি যেন পূর্ব্ব-গৌরবস্মৃতিতে, কি যেন আশাভঙ্গে, কি যেন শোকে, আমাদিগের চিত্ত পূর্ণ হইয়াছিল। কতক্ষণ পরে বন্ধু বলিলেন, "বিশ্বাস হয় কি আমাদেরই পূর্ব্ব-পুরুষ ঐ সকল গিরিগুহায় কালাতিপাত করিতেন? তাঁহারা যদি মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করিলেন, তাঁহাদের আশ্রম বিলুপ্ত করিয়া গেলেন না কেন?"

(২)

ছয় বৎসর পরে আবার খণ্ডগিরি দেখিবার নিমিত্ত উৎসুক হইলাম। কটকের ঠিক দক্ষিণে পুরী। পুরী যাইবার এক সুন্দর পাকা পথ আছে। সেই পথ দিয়া ৮ ক্রোশ গেলে পশ্চিম দিকে বাঁকিতে হয়। সেখান হইতে প্রায় ২॥০ ক্রোশ দূরে মহাদেব ভুবনেশ্বরের পুণ্যক্ষেত্র। তথা হইতে পশ্চিমাভিমুখে আরও ২॥০ ক্রোশ গেলে খণ্ডগিরি। অতএব এ পথে গেলে খণ্ডগিরি প্রায় ১৩ ক্রোশ দূরে পড়ে।

এবার খণ্ডগিরিই দেখিবার সংকল্প ছিল। এই হেতু বাঁকা পথে না গিয়া সোজা চাঁদগা-পথে যাইবার আয়োজন করা গেল। ঐ পথ দিয়া খুরদা যাইতে হয়। এজন্য উহার নাম খুরদা-রাস্তা হইয়াছে। এই পথে কটক হইতে খণ্ডগিরি ৮।৯ ক্রোশ দুরবর্ত্তী।

এবার এক প্রত্নতত্ত্ব ও ভূ-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু বন্ধু সপরিবারে যাইতেছিলেন। আহারাদি সমাপন করিয়া রাত্রি দশটার সময় গো-যানে চড়িয়া খণ্ডগিরি যাত্রা করিলাম। প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম, পথের দুই পার্শ্বে অরণ্য। ঘোর অন্ধকার রাত্রে এরূপ পথ আরও অতিক্রম করিয়াছি শুনিয়া ভয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল।

শীতকালের সূর্য্য, দেখিতে দেখিতে আকাশে উঠিয়া বসিলেন। শীঘ্র ৮টা বাজিল। আমরা খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির মধ্যস্থিত শীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া উদয়গিরির পাদদেশ-স্থিত বৈষ্ণবঠাকুরের গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম।

বাস্তবিক, খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি, একই গিরি; মধ্যস্থিত পথ দ্বারা একটি হইতে অন্যটি খণ্ডিত দেখায়। বোধ হয় এই হেতুই একটীর বিশেষ নাম খণ্ডগিরি হইয়াছে। উভয়ই বালুকাপ্রস্তরে নির্ম্মিত, উভয়ই প্রায় এক দিকে বিস্তৃত, উভয়ই প্রায় সমান উচ্চ। উদয়গিরি প্রায় ৮০০ হাত দীর্ঘ, খণ্ডগিরিও প্রায় সেইরূপ। সমভূমি হইতে উভয়ে প্রায় ৮০ হাত উচ্চ হইবে।

বালুকাপ্রস্তর বলিয়া গুম্ফা-খননের সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু বালুকা-প্রস্তর বলিয়াই গুম্ফার কারুকার্য্য বিলুপ্ত হইয়াছে। পর্ব্বতগাত্র কাটিয়া যে গৃহ নির্ম্মিত হয়, তাহাকে এদেশে গুম্ফা বলে। এরূপ গুম্ফা পশ্চিম-দিকের খণ্ডগিরি এবং পূর্ব্বদিকের উদয়গিরি, উভয়েই বর্ত্তমান। উদয়-গিরিতে যত খণ্ডগিরিতে তত নাই।

আর কাল-বিলম্ব না করিয়া আমরা প্রথমে উদয়গিরি দেখিতে উঠিলাম। একটীর পর একটী, সমুদয় গুম্ফা দেখিতে লাগিলাম। উদয়গিরির পূর্ব্বাংশে "রাণী নঅর" বা রাজারাণী নামক পূর্ব্বোক্ত দ্বিতল গুম্ফা। 'নঅর' শব্দ ন-গ-র শব্দের অপভ্রংশ। এই নাম হইতেই উহার অপরাপর নাম 'রাণীগুম্ফা', 'রাণী অন্তঃপুর' ইত্যাদির উৎপত্তি।

উহার তিন দিকে দ্বিতল-গৃহশ্রেণী। কেবল দক্ষিণ-দিক্ উন্মুক্ত। সে দিকেও গৃহ থাকিলে গুম্ফাটি আজি-কালিকার চকমিলান বাড়ীর মতন দেখাইত। মধ্যস্থিত প্রাঙ্গণ প্রায় ৩০ হাত লম্বা এবং ১৬ হাত চওড়া। দক্ষিণদিকে পূর্ব্বে কি ছিল, কে জানে। এক্ষণে তাহা বিচ্ছিন্ন পাথরে এবং তৃণগুল্মাদিতে আচ্ছন্ন হইয়াছে।

গৃহগুলি হঠাৎ দেখিলে দ্বিতল বোধ হয়। কিন্তু নীচের তলার ঠিক উপরে উপর-তলা নহে। পাহাড়ের গা যেমন ঢালু ছিল, নীচের তলার পশ্চাদ্দিকে উপর তলার গৃহগুলি তেমন খোদিত হইয়াছে।

প্রাঙ্গণের তিন দিকে সারি সারি ঘর। ঘরের সম্মুখে স্তম্ভে বারাণ্ডা। দ্বারের দুই পার্শ্বে বর্ম্মাবৃত দুই প্রহরী পাষাণদেহ বহির্গত করিয়া আছে। এই বারাণ্ডার কোথাও বিকটবদন স্থূলদেহ বামনমূর্ত্তি, কোথাও কিম্ভূতকিমাকার হ্রস্বমূর্ত্তি, কোথাও বা বঙ্কিমবপু সুকুমারীর দেহ-যষ্টি। ইহাদের মস্তকে উপরিস্থিত গুরুভার অর্পিত হইয়াছে।

নীচের বারাণ্ডা প্রায় ৪০ হাত লম্বা, ৬ হাত চওড়া, এবং ৪৷৷০ হাত উচ্চ। উপর-তলার এক একটা ঘর প্রায় ১০ হাত লম্বা, ৫ হাত চওড়া, এবং ২৷৷০ হাত উচ্চ। রাণী-গুম্ফাই সকলের মধ্যে বৃহৎ। দ্বারের উপরে যে সকল নরনারীমূর্ত্তি আছে, তাহাদের পরিধেয় ও উত্তরীয়, আভরণ, বাদ্য-যন্ত্র ইত্যাদি আজিও প্রায় অবিকৃত আকারে দেখিতে পাওয়া যায়।

পাহাড়ের আরও উচ্চে 'গণেশ-গুম্ফা'; গণেশ-গুম্ফাও বিস্তৃত।

কিন্তু উহা দ্বিতল নহে। উহাতে দুই খানি মাত্র ঘর, ঘরের সম্মুখে বারাণ্ডা। গুম্ফার দুই পার্শ্বে পাষাণময় দুই হস্তিমূর্ত্তি রহিয়াছে। গজকে গজানন ভাবিয়াই, বোধ হয় উহার নাম গণেশ-গুম্ফা হইয়াছে।

'স্বর্গপুরী গুম্ফা' প্রকৃত দ্বিতল, অর্থাৎ ইহার নীচের তলার ঠিক উপরে উপরতলা। কিন্তু ইহাই উহার ধ্বংসের কারণ হইয়াছে। 'জয়া বিজয়া,' 'বৈকুণ্ঠ', 'সর্প' প্রভৃতি আরও অনেক গুম্ফা দেখি। 'ব্যাঘ্র-গুম্ফা' আকারে ব্যাঘ্রমুখের তুল্য, গোল বৃহৎ লোল চক্ষু যেন বহির্গত হইয়া পড়িয়াছে। নাসারন্ধ্র ও আকারসদৃশ বৃহৎ। মুখবিবরে গুম্ফা খোদিত হইয়াছে। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র বিশাল দংষ্ট্রা বিকসিত করিয়া মুখব্যাদান করিয়া আছে। এইরূপ, 'সর্পগুম্ফায়' সর্পের ফণার আকারে ক্ষুদ্র গৃহ খোদিত হইয়াছে।

এইরূপ, প্রাণীর আকারে কয়েকটি গুম্ফা খোদিত হইয়াছে। কোন-টার ঘর ক্ষুদ্র; এত ক্ষুদ্র যে তন্মধ্যে কিরূপে কেহ সোজা হইয়া বসিতে পারিত, তাহাই অসম্ভব মনে হয়। এক একটা ঘর বড়, কিন্তু দ্বার এত ক্ষুদ্র যে, হস্তপদাদি কচ্ছপের ন্যায় আকুঞ্চিত না করিলে তন্মধ্যে প্রবেশ দুষ্কর। কোন কোনটার দ্বারের উপরিভাগে কত লতাপাতা, কত নরনারীর মূর্ত্তি, কত যুদ্ধ-সজ্জা। এক্ষণে কোন মূর্ত্তি প্রায় বিলীন হইয়া গিয়াছে, কোনটার হাত আছে ত পা নাই, পা আছে ত মাথা নাই। আবার, কোথাও ফলপুষ্প এখনও যেন সদ্যোনির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়।

দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব আকাশের উচ্চে উঠিয়াছেন। শীতকাল হই-লেও তাঁহার কিরণজাল ক্রমশঃ অসহ্য হইতে লাগিল। দ্রুতপদে আমরা পাহাড় হইতে নামিয়া তত্রত্য ডাক-বাঙ্গালায় আহার নিমিত্ত আশ্রয় লইলাম।

বৈকালে খণ্ডগিরি আরোহণ করিলাম। উহাতে উঠিবার নিমিত্ত কিয়-

দ্দূর পর্য্যন্ত একটা সোপানশ্রেণী আছে। কিয়দ্দূর উঠিলেই বামে ও দক্ষিণে দুই দিকে দুই পথ। দক্ষিণ দিকে 'অনন্ত গুম্ফা'। উহাতে এক খানি লম্বা ঘর, ঘরের সম্মুখে বারাণ্ডা। গৃহমধ্যে বুদ্ধদেবের ভগ্নপ্রায় প্রতিমূর্ত্তি। দ্বারের উপরে 'রাণীগুম্ফার' ন্যায় কতকগুলি স্থাপত্য-অলঙ্কার। দুই পার্শ্বে অনন্ত-ফণা-সর্পের অসংখ্য ফণা বিস্তৃত রহিয়াছে। সোপানশ্রেণীর বাম পথে গেলে কয়েকটা গুম্ফা দেখা যায়। এগুলি জৈন গুম্ফা। কোনটার মধ্যে ধ্যানী বৌদ্ধের কতকগুলি প্রতিমূর্ত্তি, কোন-টায় বা জিনমূর্ত্তি।

খণ্ডগিরির শিখরদেশে একটা আধুনিক জৈন মন্দির আছে। অমন সুন্দর স্থান আর নাই। উচ্চ বলিয়া শাদা পাথরে এখনও মৃত্তিকা সঞ্চিত হয় নাই। দূর হইতে গিরিকন্দরের আচ্ছাদন-বৃক্ষাদির ভিতর দিয়া জৈন মন্দির দৃষ্টিগোচর হয়।

সে মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে 'দেবসভা' নামক এক বৌদ্ধ-চৈত্য। উহার পূর্ব্বদিকে 'আকাশগঙ্গা' বা 'গুপ্তগঙ্গা' নামক একটা বাপী। প্রায় ৪০ হাত উচ্চে পাহাড় কাটিয়া বাপী নির্ম্মিত হইয়াছিল। পার্ব্বত্য নির্ঝরের জলে উহা বার মাস পূর্ণ থাকে। এক্ষণে উহার আদর নাই, জলও হরিদ্বর্ণ। বোধ হয়, পূর্ব্বে বাপীর জল গুম্ফাবাসিগণের পানীয় হইত।

৩

তিন বৎসর পরে পুরী হইতে প্রত্যাগমন কালে আবার খণ্ড-গিরি দেখিতে আসিলাম। খণ্ড-গিরি যতই দেখি, ততই যেন উহাতে নূতন নূতন রহস্য দেখিতে পাই।

ভুবনেশ্বর হইতে আসিতে আসিতে খণ্ড-গিরির শিখরস্থিত পূর্ব্বোক্ত শ্বেত জৈন মন্দির গাছপালার ভিতর দিয়া অস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচণ্ড সূর্য্যে চারিদিক্ দগ্ধ হইতেছিল। মৃতপ্রায় হইয়া বৃক্ষ-

লতা বিকটগন্ধ বাষ্প উদ্গীরণ করিতেছিল। যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, বন্যবৃক্ষাচ্ছাদিত গিরি-দেহের উন্মুক্ত স্থান ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে লাগিল।

ভারতের পূর্ব্ব-পার্শ্বস্থ পূর্ব্বঘাট-গিরি নামক পর্ব্বতশ্রেণী সকলেই অবগত আছেন। সেই পূর্ব্বঘাট-গিরি চিলিকা হ্রদেই শেষ হয় নাই। আরও উত্তর দিকে ওড়িষ্যার ভিতরে বিস্তৃত রহিয়াছে। প্রভেদ এই যে, এখানে স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। মৃত্তিকা ভেদ করিয়া শাখাগুলি উত্থিত হইয়াছে। ঐ সকল বিশ্লিষ্ট গিরির মধ্যে খণ্ডগিরি একটি।

উহাকে একটী গিরি বলা সঙ্গত হইল না। কেন না, বিশ্লিষ্ট বোধ হইলেও গিরিসমূহ পরস্পর প্রায় সংলগ্ন। পূর্ব্বদিকে উদয়গিরি, তার পর খণ্ডগিরি, তার পর নীলগিরি, তার পর ধবলাগিরি বা ধৌলির পাহাড়। এই ধৌলির পাহাড় উদয়গিরির দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি, উভয়েরই সামান্য নাম খণ্ডগিরি। ঐ দুই-এর মধ্যে প্রভেদ করিতে হইলে পূর্ব্বদিকেরটিকে উদয়গিরি বলা হয়। নীলগিরিতে দর্শনযোগ্য বস্তু নাই। ধৌলির পাহাড়ে সম্রাট্ অশোক-খোদিত অশোক-বার্ত্তা এখনও সভ্য জগৎকে লজ্জিত করিতেছে। ধন্য প্রিন্‌সেপ সাহেবের অধ্যবসায়, ধন্য তাঁহার গবেষণাবৃত্তি! তিনিই প্রথমে ধৌলির পাষাণ-দেহ হইতে প্রিয়দর্শী অশোকের অহিংসাধর্ম্ম,—রোগ-দুঃখের সময় ইতর প্রাণিগণের প্রতি দয়া, ও প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি সদ্‌গুণের ইতিহাস উদ্ধার করেন। তদনন্তর বিদ্যাকেশরী প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাজেন্দ্রলাল ওড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাসে তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

খণ্ডগিরির গুম্ফা কে কবে খোদিত করিয়াছিলেন? কোন্ কোন্ গুম্ফায় কি লেখা আছে? কালের কুটিলগতিতে লেখাগুলি প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। দুই এক স্থানে যাহা পড়া যায়, তাহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন যে, সমুদয় গুম্ফা এক সময়ে নির্ম্মিত হয় নাই। কোন কোন

গুম্ফা খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে খোদিত হইয়াছিল। কলিঙ্গের এক অধিপতির নাম খারবেল ছিল। কোন কোন লেখায় এই নাম পাওয়া যায়। তিনিই অনেক গুম্ফা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

ওড়িষ্যায় যত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের ক্রমিক নিদর্শন গিরিগুম্ফায়, মন্দিরে, মঠে এখনও প্রত্যক্ষ করা যায়। সিদ্ধার্থ শাক্যসিংহের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির পর প্রায় সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া এখানে তাঁহার ধর্ম্ম অপ্রতিহত ছিল। সেই সময়ে ঐ সকল ক্ষুদ্র-বৃহৎ গুম্ফা রচিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্রাকার গুম্ফাগুলি না কি সকলের প্রাচীন।

সেইদিন চিন্তা করুন, যেদিন মগধের বৌদ্ধরাজগণ দেশদেশান্তরে ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইয়াছিলেন; যেদিন ধর্ম্মের গৌরবে কত কত লোক ভিক্ষু হইয়া লোকালয় পুত্র-কলত্র পরিত্যাগ করিয়া মঠের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। নির্জ্জন স্থান পাইলে কে ধর্ম্মসাধনের নিমিত্ত কোলাহলময় নগরে বাস করিতে চায়? যে গৃহের জীর্ণসংস্কার আবশ্যক হয়, সে গৃহ ছাড়িয়া কে না গিরিগুহায় থাকিতে চায়?

আবার ভানু পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িলেন। আবার অতনুবনরাজিশ্যামিত উপত্যকা অন্ধকারে আরও শ্যামিত হইয়া উঠিল। উচ্চ খণ্ডগিরির জৈন-মন্দিরের চূড়া হইতে রবিকর ক্রমশঃ নামিয়া পড়িতে লাগিল। নির্জ্জন নিস্তব্ধ হইয়া উঠিল। বঙ্গদেশীয় এক পাগলা বৈষ্ণব কথন্ জৈন-মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছিল। সায়াহ্ন দেখিয়া তাহার স্থাপিত বিগ্রহের সম্মুখে আরতি করিতে লাগিল। তাহার মৃদঙ্গ কাঁসরের ঘোর রবে গিরিকন্দর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেই নির্জ্জন নিস্তব্ধ স্থানে অস্তাচলগামী সূর্য্যের ক্ষীণ আলোকে, মৃদঙ্গের ঘোর নিনাদে, পাগলের বিকট হাস্যে, বৃক্ষাদির ভিতর দিয়া সামুদ্র-সমীরের হু হু শব্দে, চিত্ত আকুল হইয়া উঠিল।

দধিবীজ

পক্ব দুগ্ধে দধিবীজ সংযোগ করিলে দধি হয়, ইহাতে নূতনত্ব বা জ্ঞাতব্য বিষয় কি আছে ? কথাটা সহজ বটে, কেননা অনেকেই দধি বসাইতে জানেন। কিন্তু দুগ্ধ কিরূপে কি নিগূঢ় কারণে দধিতে পরিণত হয়, তাহা বুঝা সহজ নহে।

ভাবপ্রকাশ নামক প্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থে পঞ্চবিধ দধি বর্ণিত হইয়াছে। যথা, (১) যাহা কিঞ্চিৎ ঘন কিন্তু দুগ্ধবৎ ও অব্যক্ত-রস অর্থাৎ দধিরূপে পরিণত হয় নাই, তাহা মন্দদধি। (২) যাহা সম্যক্ ঘন, যাহার স্বাদ দধির তুল্য, কিন্তু যাহাতে অম্লরস অনুভূত হয় না, তাহা স্বাদুদধি। (৩) যে দধি ঘন এবং ঈষৎ কষায়-সংযুক্ত মধুর অম্লাস্বাদ, তাহা স্বাদ্বম্লদধি। (৪) যে দধি মধুর না হইয়া অম্ল, তাহা অম্লদধি। (৫) যে দধিদ্বারা দন্তহর্ষ, রোমহর্ষ ও কণ্ঠাদিতে দাহ উৎপন্ন হয়, তাহা অত্যম্লদধি। এই পঞ্চবিধ দধির কারণ কি ?

আমাদের খাদ্যকে সামান্যতঃ পাঁচভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) পলীন, (২) পললীন, (৩) স্নেহ, (৪) পার্থিব, (৫) জল। এই পাঁচটি দ্রব্য দুগ্ধে যথোচিত পরিমাণে আছে। এই হেতু কেবল দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারা যায়। স্তন্যপায়ী শিশু কেবল দুগ্ধ পান করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অণ্ডেও এই কয়েকটি দ্রব্য যথোপযুক্ত পরিমাণে আছে, এই হেতু অণ্ডজ প্রাণিগণের শিশু অণ্ডের ভিতর পরিপুষ্ট হয়। বস্তুতঃ দুগ্ধ ও অণ্ড, আমাদের উৎকৃষ্ট খাদ্য।

আমাদের দেশে দুধ হইতে মাখন, ননী, ছেনা, দই, ঘোল, সর, ও ঘি করা হইয়া থাকে। কাঁচা দুধ মথিলে মাখন, দধি মথিলে ননী পৃথক্ হয়। মাখন, ননী ও সর এই তিন হইতে ঘি হয়। ঘি স্নেহ দ্রব্য। কাঁচা হউক

পাকা হউক, দুধের স্নেহ তুলিয়া লইলে দুগ্ধ নিঃসার হয়। স-সার ও নিঃসার উভয়বিধ দুধ গরম করিয়া দধি কিংবা অপর অম্ল যোগ করিলে, দুধ ছিঁড়িয়া যায়, ছেনা পৃথক্ হয়। স-সার দুধের ছেনায় স্নেহ থাকে, নিঃসার দুধের ছেনায় থাকে না। কৌশলক্রমে দুগ্ধ হইতে একপ্রকার শর্করা পৃথক্ করা যায়। এই শর্করা হেতু দুগ্ধ মিষ্ট বোধ হয়। দুধ পোড়াইলে ভস্ম অবশিষ্ট থাকে।

নিঃসার ছেনা পলীন, দুগ্ধ-শর্করা পললীন, ঘি স্নেহ, ভস্ম পার্থিব। এতদ্‌ব্যতীত, জল থাকে। গব্য দুগ্ধে এই সকল উপাদানের ভাগ এই,

জল	...	৮৭.০
পলীন	...	৩.৩
পললীন	...	৫.০
স্নেহ	...	৪.০
পার্থিব	...	০.৭
		১০০.০

সংস্কৃতে মাখনের নাম মৃক্ষণ, ননীর নাম নবনীত, ছেনার নাম তক্রপিণ্ড ও তক্র-কূর্চিকা, ছেনার জলের নাম মোরট। পিণ্ডাকারে চাপ-চাপ হইলে তক্রপিণ্ড, কুচি কুচি ছোট ছোট হইলে তক্রকূর্চিকা। সংস্কৃতের তক্র বাঙ্গালার ঘোল। দই আগুনে জ্বাল দিলে ছেনা পৃথক্ হয়। অতএব বোধ হইতেছে, দধিতে ছেনা ব্যক্তীভূত না হইয়া অব্যক্ত থাকে। দুধে এমন মিশিয়া থাকে যে, আদৌ বুঝিতে পারা যায় না।

দুগ্ধে অম্ল যোগ করিলে ছেনা উৎপন্ন হয়। কোন প্রকারে দুগ্ধে দধ্যম্ল উৎপাদন করিতে পারিলে সেই অম্ল-হেতু দুগ্ধ দধিতে পরিণত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, দুগ্ধে দধ্যম্ল উৎপাদনের ক্রিয়া বুঝিলেই দুগ্ধের দধিতে পরিণতি বুঝা যাইবে।

ঈষদুষ্ণ দুগ্ধে দধিবীজ যোগ করিলে দুগ্ধ দধিতে পরিণত হয়। দধিবীজ

স্থানবিশেষে 'সাজা', 'দম্বল' প্রভৃতি নামে প্রচলিত। সাজার পরিবর্ত্তে তেঁতুল, নেবু প্রভৃতির অম্লরস দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিলে দুগ্ধ স্বাদু-দধিবৎ গাঢ় হয় বটে, কিন্তু তাহা দধি নহে। অতএব দুগ্ধের সহিত যে সাজা যোগ করা যায়, তাহার সহিত দধ্যম্লের নিশ্চয়ই সম্বন্ধ আছে।

কতখানি দুগ্ধে কতখানি সাজা দিলে স্বাদুদধি উৎপন্ন হইবে, তাহা পরিমাণ করিবার উপায় নাই। তবে, সাজা যতই অম্লগুণ-বিশিষ্ট হয়, ততই অল্পমাত্রায় দিতে হয়। অল্প-মাত্র সাজা যোগে যখন বহু দুগ্ধ দধিতে পরিণত হয়, তখন সাজার অম্লরস হেতু উৎপন্ন দধি অম্ল হয় না, বলিতে হইবে।

সুরা প্রস্তুত করিতে হইলে তণ্ডুলাদি সুরার উপকরণে কিণ্ব বা সুরাবীজ যোগ করিতে হয়। নতুবা সুরা উৎপন্ন হয় না। অনেক সংস্কৃত গ্রন্থে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। বহুকাল পূর্ব্বে ভারতীয় পণ্ডিতগণ সুরা উৎপাদনের নিমিত্ত সুরাবীজের প্রয়োজন বুঝিয়াছিলেন। এ দেশে দধিও বহু বহু কাল হইতে প্রসিদ্ধ আছে।

দধ্যম্ল কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা ইউরোপে কয়েক বৎসর মাত্র নির্ণীত হইয়াছে। ফরাসী পণ্ডিত পাস্তর সাহেব সুরাবীজের প্রকৃতি নির্ণয় করেন। তদনন্তর তিনিই দধিবীজের স্বরূপ ও ক্রিয়া আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সুরা সম্বন্ধে কিণ্ব যেমন, দধ্যম্ল সম্বন্ধে দধিবীজও তেমন। অল্পমাত্র কিণ্ব-যোগে সিদ্ধ তণ্ডুলের সমুদয় বিকৃতি ঘটে, অল্পমাত্র দধিবীজ-যোগে অনেক খানি দুগ্ধ দধিতে পরিণত হয়। সুরাবীজ ও দধিবীজ এমন কি বস্তু, যাহার অত্যল্প দ্বারা প্রভূত কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইক্ষু-খর্জ্জুর-তাল প্রভৃতির মিষ্ট রস রাখিয়া দিলে গ্রীষ্মানুসারে অল্পাধিক-সময়-মধ্যে মিষ্টত্বের পরিবর্ত্তে রসে অম্লত্ব অনুভূত হয়, রসের উপরিভাগে ফেনা উৎপন্ন হয়, এবং তাহার সঙ্গে ফুট্-ফুট্ শব্দ করিয়া বুদ্-বুদ্ উঠিতে থাকে। সে অম্লের নাম শুক্ত। ক্রিয়াকে সাধারণতঃ 'গেজে' বা 'মেতে' যাওয়া বলে। সাধু-

ভাষায় ইহাকে 'সন্ধিত' বলা যায়। মিষ্টরস মেতে গেলে তাহা মাদক হয়। মত্ত হইয়া যায় বলিয়া 'মেতে' বা 'গাঁজিয়া' যাওয়া বলে।

ইক্ষু বা খর্জ্জুর রস 'নির্ম্মল' বোতলে অগ্নির উত্তাপে ফুটাইয়া এবং ফুটাইবার সময় বোতলের মুখ বদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিলে সে রস বিকৃত হইয়া শুক্তে পরিণত হয় না। সেইরূপ, মধু ও দুগ্ধ 'নির্ম্মল' বোতলে ফুটাইয়া বোতলের মুখ বদ্ধ করিলে, বহু দিন বিকৃত হয় না। বায়ুর অভাবে যে বিকৃত হয় না, তাহা নহে। কেননা বোতলের মুখ কর্কদ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ না করিয়া 'নির্ম্মল' কার্পাস-পিণ্ড দ্বারা বদ্ধ করিলেও শীঘ্র বিকৃত হয় না।

মুখ-খোলা পাত্রে খেজুর রস দুইএকদিন রাখিয়া দিলে মিষ্ট-রসের পরিবর্ত্তে শুক্তে পরিণত হয়। পাত্রের তলে একপ্রকার শ্বেত পঙ্ক পতিত হইতে দেখা যায়। সেই পঙ্কের কণিকামাত্র অপর কোন খেজুর, তাল, ইক্ষু প্রভৃতির মিষ্ট রসে নিক্ষেপ করিলে ঘণ্টাকয়েকের মধ্যে রস মাতিয়া উঠে। দিনকয়েক পরে দেখিলে পাত্রের তলে পঙ্ক অনেকখানি পতিত হইতে দেখা যায়। অতএব ঐ শ্বেত পঙ্কই মধুর রসকে সন্ধিত করে।

উক্ত শ্বেত পঙ্কের কিঞ্চিৎ অণুবীক্ষণযন্ত্র-দ্বারা দেখিলে অতীব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। এত ক্ষুদ্র যে, তিন সহস্র পাশাপাশি না রাখিলে এক ইঞ্চি হয় না। নানাবিধ পরীক্ষাদ্বারা জানা যায় যে, প্রত্যেক অণ্ড একটী গাছ। তাল-খেজুর প্রভৃতির মধুর রসে পড়িলে উহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। এই অঙ্কুরও অণ্ডাকার। অনেক অণ্ড বিচ্ছিন্ন থাকে, অনেক ৩।৪টা করিয়া মালার ন্যায় পরস্পর যুক্ত হইয়া থাকে। এই যে সূক্ষ্ম উদ্ভিদ্, ইহাই কিণ্ব বা সুরাবীজ।

কিণ্ব মধুর রসকে বিশ্লিষ্ট করিয়া স্বীয় দেহ পুষ্ট করে এবং অল্পকাল মধ্যে অসংখ্য অঙ্কুর প্রসব করে। এই ক্রিয়াবশতঃ মধুর রসের কিয়দংশ সুরায় পরিণত হয়। অতএব উদ্ভিদ্-বিশেষের জীবন-ক্রিয়াই

সুরার কারণ। জীবনের আরম্ভে সুরার আরম্ভ, জীবনের অবসানে সুরার অবসান।

এক্ষণে দধ্যম্ল উৎপাদনের কারণ বুঝা সহজ হইবে। বস্তুতঃ, ইক্ষু-শর্করার সন্ধান-ফল যেমন সুরা, দুগ্ধশর্করার সন্ধান-ফল তেমনই দধ্যম্ল। যেমন উদ্ভিদ্-বিশেষের ক্রিয়াবশতঃ ইক্ষু-খর্জ্জুর প্রভৃতির মধুর রস সুরাতে পরিণত হয়, তেমনই অন্য এক প্রকার উদ্ভিদের ক্রিয়াবশতঃ দুগ্ধ-শর্করা দধ্যম্লে পরিণত হয়। কিণ্ব দ্বারা শর্করা সুরা ও অঙ্গারকাম্ল নামক গেসে পরিণত হয়। সুরা, জলের সহিত মিশ্রিত থাকে, অঙ্গারকাম্ল গেস উৎপন্ন হওয়াতে সমুদয় রসে ফুট্ হইতে থাকে। ইহাতেই খেজুর রসের ফেনার উৎপত্তি। এই গেসের বুদ্‌বুদ্ ভাঙ্গিয়া যাওয়াতেই ফুট্‌ফুট্ শব্দ হয়। দধ্যম্ল-উৎপত্তির সময় এতাদৃশ ফেনা বা ফুট্ উৎপন্ন হয় না, কেন-না দুগ্ধ-শর্করার দধ্যম্লে পরিণত হইবার সময়, অঙ্গারকাম্ল গেস উৎপন্ন হয় না।

সুরার কিণ্ব আর দধ্যম্লের কিণ্ব এক নহে। কিন্তু দধিকিণ্বও সূক্ষ্ম উদ্ভিদ্-বিশেষ। এই উদ্ভিদ্ দুগ্ধের শর্করাকে দধ্যম্লে পরিণত করে। সেই অম্লহেতু দুগ্ধের পনীর মৃদুভাবে অপরাপর দ্রব্য হইতে পৃথক্ হয়, দুগ্ধও দধিতে পরিণত হয়।

বাস্তবিক, দধির জলীয় ভাগ অণুবীক্ষণ-যন্ত্র-দ্বারা দেখিলে উহাতে অতীব সূক্ষ্ম গোলাকার বিন্দুর ন্যায় অণুজীব দেখিতে পাওয়া যায়। অপবিত্র পাত্রে অপবিত্র দধি-বীজ যোগে দই বসাইলে আরও নানাজাতীয় অণুজীব জন্মে।

দধি যত অম্ল তাহাতে তত দধিবীজ লক্ষিত হয়। স্বাদু দধিতে অল্প, অত্যম্ল দধিতে অসংখ্য দেখা যায়। তিন চারি দিবসের পুরাতন দধির এক বিন্দু জলে কোটি কোটি বীজ দেখা যায়। এই বীজ শুষ্ক করিলে তাহার জীবনী শক্তি খর্ব্ব হয়, ফুটাইলে মরিয়া যায়।

উপরে বলা গিয়াছে যে, দধিবীজ দ্বারা দুগ্ধের শর্করাংশ দধ্যম্লে পরিবর্ত্তিত

হয়। সেই অম্লযোগে দুগ্ধের পলীন দ্রবাবস্থা ত্যাগ করিয়া পিণ্ডের আকার ধারণ করে, এবং দুগ্ধের জলীয়াংশ হইতে পৃথক্ হয়। কিন্তু দধিতে যে অবস্থায় ছেনা থাকে, তাহাকে প্রকৃত ছেনার অবস্থা বলা যাইতে পারে না। উহা ছেনার আগু অবস্থা। দধিকে উষ্ণ করিলে প্রকৃত ছেনারূপে ব্যক্ত হয়।

পরীক্ষার দ্বারা দেখা যায় যে, উপযুক্ত দুগ্ধে দধিবীজ পড়িলে ৩৫°শ হইতে ৪০°শ উষ্মায় তাহার সম্যক্ ক্রিয়া হয়। বস্তুতঃ, একই গাভীর খাটি দুগ্ধ ফুটাইয়া নিম্নলিখিত পরীক্ষা করা গিয়াছিল। তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, প্রথম ভাগের উষ্মা ৪০°শ, দ্বিতীয় ভাগের ৪৮°শ, তৃতীয় ভাগের ৫৮°শ করিয়া একই সাজার সমপরিমাণ মিশ্রিত করা হইয়াছিল। ২৪ ঘণ্টা পরে দেখা গেল যে, প্রথম দুগ্ধ উৎকৃষ্ট স্বাদু দধিতে পরিণত হইয়াছে। এমন বসিয়া গিয়াছিল যে, পাত্র উপুড় করাতেও দধি বিচলিত হয় নাই। ইহা শ্বেতবর্ণ হইয়াছিল, এবং বোধ হয় ফলারী পেটুক-মহাশয়েরা প্রথম শ্রেণীর দধি বলিতে পারিতেন। দ্বিতীয় পাত্রের দধি ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ হইয়াছিল, ইহা তেমন বসে নাই, এবং কিছু জলও নিঃসৃত হইয়াছিল। তৃতীয় পাত্রের দধি অধিক হরিদ্রাবর্ণ হইয়াছিল, এবং তাহাতে জলীয় ভাগও অধিক দৃষ্ট হইয়াছিল।

এইরূপ পরীক্ষাদ্বারা বোধ হইতেছে যে, ৩৫°শ হইতে ৪০°শ উষ্মায় বসান দই স্বাদু হয়। এই সকল পরীক্ষা শীত কালে করা হইয়াছিল, এবং দুগ্ধ সতত সমান উষ্ম রাখিবার চেষ্টা করা হয় নাই। বোধ হয়, দুগ্ধ কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত এই প্রকার উষ্ম রাখিলে উৎকৃষ্ট দধি হইতে পারে। আমাদের সুস্থদেহ ৩৭°শ উষ্ম। গ্রীষ্মকালে দই বসান কঠিন; কিন্তু শীতল স্থানে রাখিলে কঠিন হয় না।

সাজার পরিমাণ বলা কঠিন। দধিবীজের সংখ্যানুসারে সাজার পরিমাণ

ঠিক করিতে হয়। কিন্তু তাহা অসাধ্য। দেখা গিয়াছে, যে দই যত টক তাহাতে তত বীজ থাকে। অবশ্য পচা দধির বীজ সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়।

ছেনার জলে দধিবীজ থাকে। বস্তুতঃ ছেনার জল দিয়া অনায়াসে দধি বসাইতে পারা যায়। দধি-যোগে দুগ্ধের ছেনা কাটিলে দধির বীজ ছেনার জলে থাকিয়া যায়। ছেনার জলে দুগ্ধ-শর্করা বর্ত্তমান। সুতরাং তাহাতে বীজের পরিপুষ্টি ও বংশ-বৃদ্ধি বিলক্ষণ হইতে থাকে। সদ্য ছেনা-কাটা জলে অল্পই থাকে। অতএব দুই এক দিনের বাসি জল চাই।

বিলাতে উপযুক্ত খাদ্য দিয়া সুরাবীজ পৃথগ্ভাবে জন্মান হয়। লক্ষাধিক সের সুরাবীজ এইরূপে জন্মাইয়া টিনের কৌটায় বিক্রয় হয়। ইহাকে 'ঈষ্ট' বলে। সুরা করিতে ইহার প্রয়োজন পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, পাঁওরুটী ফুলাইবার নিমিত্ত সুরাবীজ যোগ করা হয়।

এইরূপ দধিবীজ পৃথক্ করিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে না কি? আমাদের দেশে দধির যেরূপ আদর, অন্য কোথাও সেরূপ নাই। সাজার ইতর-বিশেষে, উহার অম্লরসের পরিমাণ অনুসারে, ও অপরাপর অণুজীবের ক্রিয়ানুসারে দধির গুণের প্রভেদ ঘটে। শুদ্ধ দধিবীজ উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলে স্বাদু দধি করা সহজ হয়।

এই সকল সন্ধান-বীজের উৎপত্তি কিসে? ময়লায় নানা প্রকার কীট জন্মে, জান্তব পদার্থ পচিয়া গেলে তাহাতে নানাবিধ অণুজীব দৃষ্টিগোচর হয়। খেজুর রস রাখিয়া দিলে ফেনিল হইয়া উঠে। ইহার কারণ যদ্যপি উদ্ভিদ্-বিশেষ হইল, তবে খেজুর-রসে সে উদ্ভিদ্ কোথা হইতে আইসে? দুগ্ধ রাখিয়া দিলে তাহা নষ্ট হয় এবং তাহাতে অম্লত্ব অনুভূত হয়। মধু রাখিয়া দিলে কিয়ৎ দিন পরে অম্ল হয়। এ সকল স্থলে কোন বীজ উপ্ত হয় না, অথচ কিরূপে উৎপন্ন হয়? অণুজীব আপনা-আপনি জন্মে?

কিন্তু দেখা গিয়াছে কোনও জীব, তাহা অণুপ্রমাণ হউক, আপনা-

আপনি উৎপন্ন হয় না। "জীবাৎ জীবঃ" এই মত এক্ষণে পণ্ডিতগণ স্বীকার করিতেছেন। সূক্ষ্মদেহী অণুজীব বায়ুতে ধূলিবৎ ভাসিয়া বেড়ায়। দধিবীজ ও সুরাবীজ এইরূপে বায়ুতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে পড়িলে তাহাতে বাড়িতে থাকে। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, মধুর-রসপূর্ণ বোতলের মুখ বন্ধ রাখিলে সে রস বিকৃত হয় না। তূলাপিণ্ড দ্বারা মুখ বন্ধ করিলে তূলাদ্বারা অণুজীব প্রতিরুদ্ধ হয়। চালনি দ্বারা যেমন তুষ হইতে তণ্ডুল পৃথক্ করিতে পারা যায়, তূলা অণুজীবকে তেমন ছাঁকিয়া ছাঁকিয়া শুদ্ধ বায়ু বোতলে যাইতে দেয়। এই হেতু মধুর রস বিকৃত হয় না। কিন্তু বোতল প্রথমে অণুজীব-শূন্য করিয়া লইতে হইবে। তখন তাহা 'নিরণুজীব' হয়। এইরূপ 'নিরণুজীব' দুগ্ধ ও বিবিধ খাদ্য নিরণুজীব পাত্রে বদ্ধ থাকিয়া ক্রয়-বিক্রয় হইতেছে।

এই গুণ-আবিষ্কারের বৃত্তান্ত লিখিতেছি। অনেক দিন হইল পারিসের মেচ্‌নিকফ্‌ সাহেব ও তাহার দুই বন্ধু ইউরোপের বুল্‌গেরিয়া রাজ্যে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন সে রাজ্যের বহুলোক দীর্ঘায়ুঃ। জন-সমুদয়ে ত্রিশলক্ষ হইবে কিনা সন্দেহ, কিন্তু তিন চারি সহস্র শতায়ুঃ। ইহারা এমন স্বচ্ছন্দে কাজ কর্ম্ম করিয়া বেড়ায় যেন বয়স ষাটি-সত্তরের অধিক নহে। ইহারা বয়সে বৃদ্ধ হইলে আকারে স্বাস্থ্যে ও স্ফূর্ত্তিতে যুবা। একশত দশ, পনর, কুড়ি বৎসরের এদিকে অনেকের মৃত্যু হয় না। মেচ্‌নিকফ্‌ এই দীর্ঘজীবনের কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, ছেলে হইতে বুড়া, সে দেশের সবাই প্রত্যহ দই খায়। পরে অনুমান করিলেন দধি-ভোজন-হেতু সেদেশের লোকে এত দীর্ঘায়ুঃ হয়।

মানুষের জরা কেন হয়, মানুষ শতায়ুঃ হয় না কেন,—এই প্রশ্নের নানা উত্তর কল্পিত হইয়াছে। একটা উত্তর এই যে, আমাদের উদরে যে পৃথু অন্ত্র আছে, তাহাতে বহুজাতি অগণ্য অণুজীব বাস করে। ইহাদের ক্রিয়ায়

একপ্রকার বিষ জন্মে। সে বিষ রক্তের সহিত প্রবাহিত হইয়া দেহের যাবতীয় অঙ্গের ও ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা বিনষ্ট করে। একদিনে করে না, অল্পে অল্পে বয়স-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, আহারাদির দোষে এই বিষ বাড়িতে থাকে। ফলে জরা উপস্থিত হয়, মানুষের আয়ুঃ হ্রাস পায়। জরা-বিষ না জন্মিলে সে বিংশোত্তর শত বর্ষ বাঁচিবে।

মেচ্‌নিকফ্‌ অন্ত্রস্থিত বিষ-জনক অণুজীব ধ্বংসের উপায় অন্বেষণে দেখিলেন, বুল্‌গেরিয়ার দধিতে একজাতি অণুজীব থাকে। সে অণুজীব উক্ত বিষ-কর অণুজীবকে ধ্বংস করিতে পারে। অতএব দধি ভোজন দ্বারা এক দিকে যেমন দেহ পুষ্ট ও বলবান্‌ হয়, অন্যদিকে বুল্‌গেরিয়া-অণুজীব অন্ত্রে বাস করিয়া জরা-বিষ প্রতিষেধ করে, দেহকে যুবা করিয়া রাখে। আমাদের দেশের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদে দধির গুণ বর্ণিত আছে। ইহা স্নিগ্ধ, কৃশতানাশক ও প্রাণকর। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ভাব-প্রকাশ-লেখক প্রাচীন ‘প্রাণ-কর’ স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তিনি দধির দোষ-গুণ ধরিয়া তক্র-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “তক্র সেবন দ্বারা কখনও ব্যথা পাইতে হয় না, রোগগ্রস্ত হইতে হয় না ; এমন কি পণ্ডিতেরা বলেন, অমৃত দেবগণের যেমন সুখাবহ, তক্র মানবগণের তেমন।” দধির সহিত অর্দ্ধ ভাগ জল মিশ্রিত করিয়া মন্থন দ্বারা স্নেহ (ননী) পৃথক্ করিলে যে নাতি-গাঢ় নাতি-দ্রব পানীয় থাকে তাহার নাম তক্র। (নির্জ্জল দধি মন্থন করিয়া নবনীত উদ্ধার না করিলে ঘোল।) আয়ুর্ব্বেদ মতে, হেমন্ত শীত ও বর্ষাকালে দধি, এবং শীত-কালে তক্র প্রশস্ত। দধিভোজনেরও বিধি আছে। তক্র অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ হইলেও আয়ুর্ব্বেদমতে দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষেও ক্ষত মূর্চ্ছা ও দাহ রোগে নিষিদ্ধ।

সে যাহা হউক, আমাদের ঘরের দধিতে বুল্‌গেরিয়া-বীজ সর্ব্বদা থাকে না, থাকিলেও প্রায়ই অল্প থাকে। অন্য সাধারণ অণুজীব অধিক

হওয়াতে বুল্‌গেরিয়া-অণুজীব বাড়িতে পায় না। বস্তুতঃ বহু জাতীয় অণুজীব দ্বারা দধি বসাইতে পারা যায়; কোন্ দই কেমন, তাহা জানা নাই।

বিজ্ঞানে যাহা দেখা গেল, কাজেও তাহা ঠিক। গোয়ালা দই বসায়, কিন্তু ভূয়োদর্শনের পর উত্তম স্বাদু দধি করিতে পারে। যে হাঁড়ীতে বসায়, তাহা প্রথমে উত্তম রূপে ধুইয়া আগুনে পোড়াইয়া নিরণুজীব করে। খাঁটি দুধ পাইতে চেষ্টা করে। জল-মিশান দুধে দোষ তত হয় না, যদি জল ভাল হয়। যে দুধ-ই হউক তাহা অন্ততঃ আধঘণ্টা ফুটাইয়া দুধের ও জলের আগন্তুক অণুজীব মারিয়া ফেলে। জলুয়া দুধ হইলে ফুটাইয়া সে জল মারিয়া ফেলে। জলুয়া দুধে দই ভাল বসিতে পারে না। হাঁড়ীর দুধ পাক হইলে উনানের আর জ্বাল দেয় না। শীতল হইয়া আমাদের মতন উষ্ম হইয়া আসিলে দধি-বীজ যোগ করে, শীতকাল হইলে হাঁড়ীটি উনানের নিবস্ত আগুনের উপর বসাইয়া রাখে। রাত্রি দশটার সময় বসাইলে পরদিন ১০টা ১২টার সময়ে দই বসিয়া যায়। গোয়ালা অজ্ঞাত বীজ গ্রহণ না করিয়া নিজের জ্ঞাত বীজ গ্রহণ করে। অনেক গৃহিণীও উত্তম দধি বসাইতে পারেন। কিন্তু বিনা শিক্ষা ও ভূয়োদর্শনে কোনও কর্ম্ম উত্তম হয় না। দুধে কিছু চীনি মিশাইয়া দই বসাইলে শীঘ্র বসে। কারণ দধি-বীজ চীনিকে বিশিষ্ট করিয়া অম্লে পরিণত করে।

দধি হইল; এখন দধি-ভোজন-সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা কর্ত্তব্য। ইয়ুরোপে দধি-ভোজনের গুণ প্রকাশিত হইয়াছে; দধি কেবল পুষ্টিকর ভোজ্য নহে বয়ঃস্থাপকও বটে।

অগ্নিমন্থন

একবার সেই দিন কল্পনা করুন, যে দিন আদিম মানব ভূগর্ভ নিহিত অগ্নি উদ্গীর্ণ হইতে দেখিয়াছিল, যে দিন বজ্রনির্ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ বৃক্ষচূড়া দগ্ধ হইতে দেখিয়াছিল, কিংবা পবনতাড়িত বৃক্ষশাখাদ্বয়ের পরস্পর ঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে দেখিয়াছিল। আবার কল্পনা করুন, বন্য মানব অরণিমন্থনে অগ্নি উৎপাদন করিতেছে, কঠিন প্রস্তরের প্রবল সংঘাতে স্ফুলিঙ্গ নির্গত করিতেছে।

ইহাও স্মরণ করুন, শলাকার আকারে কাঠের বাক্সের মধ্যে অগ্নি লুক্কায়িত আছে, এবং তদবস্থায় হাতে হাতে, বস্ত্রের মধ্যে যেথানে সেথানে নীত হইতেছে। এমন কি, বজ্রাগ্নি বোতলে আবদ্ধ হইয়া ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদা প্রস্তুত।

প্রাচীন মানব হইতে বর্ত্তমান সভ্য মানবের কি আকাশ পাতাল অন্তর! কি উচ্চ উচ্চ সোপান আরোহণ করিয়া প্রাচীন মানব সভ্য মানবে পরিণত হইয়াছে। ভাবুন দেখি, সেই আদিম মানবের প্রথম অগ্নিদর্শন; তাহার জীবনের কি এক স্মরণীয় ঘটনা হইয়াছিল, কত বিস্ময় কত ভয় তাহার হৃদয়কে আপ্লুত করিয়াছিল।

কোন্ বুদ্ধিমান্ বন্য মানব দুই বস্তুর ঘর্ষণে তাপ অনুভব করিয়াছিল, কোন্ কুতুহলী সেই তাপকে অগ্নিরূপে আবির্ভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল! এমন নির্জীব অসাড় শীতলস্পর্শ কোমল পদার্থে, এ কি ভয়ঙ্কর শক্তি নিহিত রহিয়াছে! সেই বৃক্ষ, যাহা চারি পাশে অগণ্য দাঁড়াইয়া আছে, যাহাকে লইয়া কত ক্রীড়া-কৌতুক করা গিয়াছে, সেই বৃক্ষের অন্তরালে এ কিপদার্থ!

ইহার প্রবল শক্তির নিকট মানব ত কিছুই নয়! অরণ্যের এক পার্শ্বে সেই শক্তি হঠাৎ আগমন করিয়া বিশাল মহীরুহ, স্থূল লতা, তৃণ, গুল্ম, পশু, পক্ষী—সমুদয় অরণ্য ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, বহুকালের অরণ্যের পরিবর্ত্তে শেষে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা ফেলিয়া যায়!

ইতর প্রাণী ও অসভ্য মানবের মধ্যে বহু বিষয়ে প্রভেদ আছে, সত্য; কিন্তু এ কি প্রভেদ, যাহা অদ্যাপি কোনও ইতর প্রাণী লোপ করিতে পারে নাই। চিরদিনই অগ্নি ইতর প্রাণীর নিকট আতঙ্কের কারণ; কিন্তু বন্য মানবও তাহাকে জন্মাইতে পারে, মারিতে পারে। ইচ্ছা করিলেই যাহাকে জন্মাইতে ও মারিতে পারা যায়, তাহা নিশ্চিত তুচ্ছ পদার্থ। মানবের এই ক্ষমতা তাহাকে অপর সকল জন্তু হইতে পৃথক্ করিয়াছে। জীববিজ্ঞানে মানবের লক্ষণ খুঁজিয়া পাই না; অগ্নিবিজ্ঞানে তাহার লক্ষণ দেখিতে পাই; মানব অগ্নি-উৎপাদনকারী জীব।

প্রকৃতির উপরে মানবের আধিপত্য, তাহার এই ক্ষমতার গুণে হইয়াছে। কোন্ প্রবীণ কৌতুকাবিষ্ট মানব দগ্ধ অরণ্যভূমিতে প্রস্তরের বিকার দেখিয়াছিল। এ কি পাথর, যাহা অগ্নিতে দ্রব হইয়া যায়; অগ্নির এ কি ক্ষমতা, যে কঠিন প্রস্তরও অন্যরূপ ধারণ করে। যাহারা নিবিষ্টচিত্তে নররূপী বানরের বা বনমানুষের কৌতুক দেখিয়াছেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন তাঁহাদের কৌতূহল শীঘ্র নিবৃত্ত হয় না। বন্য মানুষেরই কৌতূহলে প্রস্তর হইতে লৌহের উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু সে কি দিন, যে দিন বন্য মানব লৌহের অস্ত্র নির্ম্মাণ করিল; যে দিন লৌহাস্ত্র দ্বারা পাষাণের অঙ্গ বিদীর্ণ হইতে লাগিল; যে দিন বন্য বৃক্ষ, বন্য জন্তু সেই অস্ত্রের আঘাতে ধরাশায়ী হইতে লাগিল! সেই দিন সভ্য শিশুর জন্ম।

বৈদিক সাহিত্যে ও পুরাণে অগ্নির প্রতি যে সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা হইতে দুইটি চিন্তা মনে আসে। বৈদিক ঋষিগণের নিকট অগ্নি এক

গূঢ় রহস্যময় বস্তু ছিল, এবং তাঁহারা অগ্ন্যুৎপাদন অনায়াসসাধ্য বিবেচনা করিতেন না। এমন অগ্নি,—যাহার বাস বিদ্যুতে, সূর্য্যের কিরণে, দীপের শিখায়; ইন্ধনে যাহার ক্ষয় না হইয়া বৃদ্ধি হয়,—সে অগ্নি নিশ্চয়ই অজ্ঞেয় দুর্জ্জয় দেববিশেষ হইবেন। ইন্দ্র কোথায় কোন্ মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকেন, কে জানে; কিন্তু তাঁহার অস্ত্র আমাদের বিনাশ সাধন করে! কোথায় কি সেই দুর্নিরীক্ষ্য গোল-পিণ্ড; যাহার করস্পর্শে জলস্থল শুষ্ক হইয়া যায়, সূর্য্যকান্ত অগ্নি বমন করিতে থাকে! এ কি বস্তু যাহার লক্-লক্ সপ্তজিহ্বা-স্পর্শে চরাচর দগ্ধ হইয়া যায়! এই রূপ চিন্তাতেই সরল-স্বভাব ঋষিগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বোধ হয়, এই হেতু তাঁহারা অগ্নিরক্ষায় এত মনোযোগী হইয়াছিলেন। অগ্নির আকারে দেবগণ মানবের দৃশ্য হন; এইখানেই তাঁহাদিগের নিকট আশা আকাঙ্ক্ষা জানাইতে পারা যায়।

অগ্নিরক্ষার আরও এক কারণ ছিল; বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, ঋষিগণ অত্যন্ত শীতল প্রদেশে বাস করিতেন। সে প্রদেশে শীতও যেমন, ঘোর বর্ষাও তেমন। সে বর্ষা এমন যে, তাহা বর্ষ গণিবার উপায়স্বরূপ হইয়াছিল। এমন শীত যে, অগ্নিহোত্রী হইতে হইয়াছিল। এই শীতাতিশয্য-বশতঃ কাশ্মীরের শ্রমজীবী কার্মিক বক্ষঃস্থলে অগ্নিপাত্র ঝুলাইয়া রাখে। মনুর সময়েও শীত-নিবারণার্থ কম্বলদানের ব্যবস্থা ছিল। যাঁহাদিগকে শীতের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়, তাঁহারা দিবারাত্র অবশ্য অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাখেন। ইহার অন্যথা অস্বাভাবিক। দেশবিশেষের লোকেরা যদি অগ্নির উপাসক হইয়াছিল, তাহারা প্রকৃতির কঠোরতায় হইয়াছিল।

আধুনিক জড়বিজ্ঞানও অগ্নির ধ্যান করে, কিন্তু স্বরূপ জানিতে পারে নাই। ইহারও নিকট অগ্নি গূঢ় রহস্যপূর্ণ। সূর্য্য হইতে সেটা কি আসে,

যেটা আমাদের ত্বকের মধ্যস্থিত বাতবহা-নাড়ীতে বিপ্লব উপস্থিত করে, যেটা ঘর্ষণে জাত হয়, বিদ্যুৎ হইতে বহির্গত হয়, দুই বস্তুর নৈকট্যে প্রকাশিত হয়। নিরর্থক শব্দের আড়ম্বরে বিড়ম্বিত না হইলে অগ্নি অদ্যাপি অজ্ঞাত ; বোধ করি, অজ্ঞেয়ই থাকিবে।

কখন-কখন ঋষিদিগের অগ্নি হারাইয়া যাইত। তখন তাঁহাদের মনে কত ভাবনা, কত আশঙ্কা উদিত হইত! তখন অগ্নির অনুসন্ধান করিতে হইত। গ্রীক পুরাণে আছে, প্রথম মানব সুখে শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিতেছিল। তখন বসন্তকাল চিরকাল বিরাজ করিত ; শীত ছিল না, অগ্নি আবশ্যক হইত না। কুক্ষণে প্রমন্থ (Prometheus) অগ্নি আবিষ্কার করেন। তদবধি মানবের অধঃপতন হইয়াছে, দুশ্চিন্তা হইয়াছে। এক গ্রীক্ পুরাণে, তিনি স্বর্গ হইতে অগ্নি অপহরণ করিয়া মর্ত্যগণকে দান করিয়াছিলেন। তদবধি মানবগণ শিল্পকার্য্য করিতে শিখিয়াছে।

আমাদের পুরাণেও অগ্নির অন্তর্ধানের কথা আছে। বায়ু পুরাণে এ বিষয়ের একটী সুন্দর আখ্যান আছে। উর্বশী ও পুরুরবার প্রণয়-কাহিনী চিরপ্রসিদ্ধ। উর্বশী-লাভে বঞ্চিত হইয়া পুরুরবা কাতরোক্তি করিলে উর্বশী তাঁহাকে গন্ধর্বগণের নিকট বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তদনুসারে রাজা গন্ধর্বদিগের নিত্য সালোক্য প্রার্থনা করিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, গন্ধর্বলোকে থাকিতে পারিলে উর্বশীসঙ্গ লাভ ঘটিতে পারিবে। গন্ধর্বেরা রাজাকে অগ্নি-পূর্ণ এক স্থালী দিয়া সেই অগ্নি দ্বারা যজ্ঞ করিতে বলিলেন। রাজা সেই অগ্নি অরণিতে নিক্ষেপ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখিলেন, অরণিতে অগ্নি নাই, তৎস্থানে এক অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মিয়াছে। ইহাতে তিনি বিস্মিত হইয়া গন্ধর্বদিগকে জানাইলেন। তাঁহারা সমুদয় বার্ত্তা শুনিয়া বলিলেন, অশ্বত্থের অরণি করিয়া যথাবিধি অগ্নিমন্থন কর।

এই আখ্যান হইতে বোধ হয় গন্ধর্বেরা অগ্নি উৎপাদন করিতে জানিতেন, এবং তাঁহারাই মর্ত্ত্যজনকে অগ্নি ও অগ্ন্যুৎপাদন বিদ্যা দান করিয়াছিলেন। পুরুরবা অরণিতে অগ্নি নিক্ষেপ করিয়া ভাবিয়াছিলেন, সে অগ্নি চিরকাল থাকিবে, নির্বাণ হইবে না। অশ্বত্থের শাখা শীঘ্র মরে না। কোন অনুকূল কারণে অরণিটি ভূমিতে মূল বিস্তার করিয়া বৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল। বোধ করি, অশ্বত্থ কাষ্ঠের অরণি দ্বারা অগ্নিমন্থন তৎকালে জানা ছিল না।

রঘুবংশে কালিদাস লিখিয়াছেন যে, রাজা সসত্ত্বা মহিষী সুদক্ষিণাকে দেখিয়া মনে করিলেন—

শমীমিবাভ্যন্তরলীনপাবকাম্।

যেন শমীগর্ভে অগ্নি লীন হইয়া আছে। ইহার ব্যাখ্যায় মহাভারতে (অনুঃ পঃ) দেখি, পূর্ব্বকালে অগ্নি শৈব তেজঃ পাইয়া অসহ্য জ্বালা হইতে শান্তিলাভ নিমিত্ত প্রথমে রসাতলে, পরে অশ্বত্থগর্ভে, তদনন্তর শমীগর্ভে আশ্রয় লইলেন। দেবতারা তারকবধের নিমিত্ত সেনানী সৃষ্টি করিবার সময় ইতস্ততঃ অগ্নি অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু পাইলেন না। শেষে শমীগর্ভে অগ্নি দেখিলেন, এবং দেবকার্য্যে নিয়োগ করিলেন। তদবধি শমীগর্ভেই অগ্নি দৃশ্য হয়, এবং মানবগণ অগ্নি উৎপাদন করিতে জানিলেন।

এই আখ্যানে মানবগণের অগ্নি-উৎপাদন-চেষ্টা লুক্কায়িত আছে। রসাতলের অগ্নি আধুনিক নামে আগ্নেয়গিরি। বোধ করি, এই অগ্নি আদিম মানব জানিতে পারিয়াছিল। অশ্বত্থ-গর্ভের অগ্নি বিদ্যুদগ্নি হইতে পারে, এবং অশ্বত্থ ও শমীগর্ভে শেষে অরণিতে অগ্নির জন্ম হইয়াছিল।

বস্তুতঃ, ওড়িষ্যার পার্বত্য জাতি অশ্বত্থকাষ্ঠের অরণি দ্বারা অদ্যাপি অগ্নি উৎপাদন করিয়া থাকে। শমীবৃক্ষের অরণি দেখি নাই; তদ্দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিতে কত পরিশ্রম হয়, জানি না। কিন্তু অশ্বত্থবৃক্ষ অপেক্ষাও

উৎকৃষ্ট এক বৃক্ষ আছে। বাঙ্গালায় তাহাকে গণিয়ারী বলে, তাহার সংস্কৃত নাম অগ্নিমন্থ। কারণ অগ্নিমন্থনের যোগ্য। দুই অরণি করা কঠিন নহে। অগ্নিমন্থের একখান চেপটা কাঠে একটু গর্ত্ত করিয়া এবং সেই গর্ত্তে প্রবেশ করিতে পারে এমন গোল মুখ করিয়া ১০।১২ আঙ্গুল কাঠি দুই হাতে ২।৩ মিনিট ঘুরাইলে গর্ত্তে অগ্নি উৎপন্ন হয়। মধ্যে মধ্যে কাঠিটির উপর হইতে নীচের দিকে, এবং নীচে হইতে উপর দিকে হাত সরাইয়া লইলে ভাল হয়। বলা বাহুল্য চেপটা কাঠখানি পা দিয়া ধরিয়া রাখিতে হইবে।

যাহারা অসভ্য মানব জাতির অগ্নি উৎপাদন ক্রিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন অরণি দ্বারা অগ্নি উৎপাদনের ত্রিবিধ রীতি আছে। কোন-কোন জাতি হাত দিয়া না ঘুরাইয়া অরণিটি দোড়ী দিয়া দধিমন্থনের মতন এদিক্ ওদিক্ ঘুরাইয়া অগ্নি উৎপাদন করে। হাতে ঘুরান অপেক্ষা ইহাতে শীঘ্র অগ্নি পাইবার কথা। কোন-কোন জাতি লম্বা চেপটা কাঠে লম্বা নালী করিয়া তন্মধ্যে অরণি লম্বাবম্বী এক দিক্ হইতে অন্য দিক্ পর্য্যন্ত বেগে চালনা করিয়া থাকে। অপর কোন জাতি দুই খণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠ-শলাকা আড়াআড়ি ঘষিয়া অগ্নি করে। বাঁশের কঞ্চি দুই খণ্ডে চিরিয়া পরস্পর ঘষিলে অগ্নি জন্মে। প্রকৃতি যেন এই উদ্দেশ্যের সাহায্য নিমিত্ত বাঁশে বালুকাকণা মাখাইয়া রাখিয়াছেন।

সে যাহা হউক, অরণির পর ইস্পাত ও অগ্নিপ্রস্তরে (চক্মকির পাথরে) অগ্নি পাওয়া যাইত। এ দেশে আর্য্য-সমাজে কত কাল পর্য্যন্ত অরণি ছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। বোধ করি, পুরাণ-রচনার সময়েও অরণি চলিত ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে অগ্নিচূর্ণ (বারুদ), নালিকা অস্ত্র (বন্দুক) এবং তৎসঙ্গে অগ্নিপ্রস্তরের প্রমাণ আছে। সূর্য্যকান্তমণি বহু প্রাচীনকাল হইতে এ দেশের লোকে অবগত ছিল। তৎকালে উহা মণি-বিশেষ ছিল। কিন্তু

এ দেশে আরও পূর্ব্বকাল হইতে কাচ-করণ কলা ছিল, কৃত্রিম সূর্য্যকান্ত হয়ত দুষ্প্রাপ্য ছিল না। অগ্নি-প্রস্তর ও ইস্পাতও ছিল; তথাপি এখনও যাগ করিবার সময়ে পুরোহিত-মহাশয় অরণির অগ্নি অন্বেষণ করেন। ভাবিয়া দেখুন, সেই প্রাচীনকালের অরণি, আর আজকালকার তাড়িতাগ্নির মধ্যে কত অন্তর।

সমাপ্ত

টীকা

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ

২ পৃষ্ঠা। পূর্ব্বকালে হিন্দুগণ পাতালবাসীর সংবাদ পাইয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁহারা সাইবিরিয়ার পূর্ব্বোত্তর পথ দিয়া আমেরিকায় গিয়াছিলেন। মেক্সিকো প্রদেশে আর্য্য সভ্যতার বহু চমৎকার চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে।

ব্যাস (diameter) × ৩.১৪১৬ = বৃত্ত-পরিধি (circumference)। বৃত্ত-পরিধির ৩৬০ ভাগের এক ভাগের নাম অংশ (degree), এক অংশের ৬০ ভাগের এক ভাগের নাম কলা (minute), এক কলার ৬০ ভাগের এক ভাগের নাম বিকলা (second), অতএব ১ বিকলা বৃত্তপরিধির ১২,৯৬,০০০ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

চন্দ্রলোক—the world of the moon। 'লোক' শব্দের আদিম অর্থ a division of the universe। চন্দ্রবিম্ব—থালার মতন যাহা দেখি, the moon's disc। উহার ব্যাস প্রায় ৩১ কলা। চন্দ্রের দূরত্বও জানা। এই দুই ধরিয়া গণিলে চন্দ্রের ব্যাস প্রায় ২০০০ মাইল বলিয়া জানা যায়। অর্থাৎ ভূ-ব্যাসের প্রায় চতুর্থাংশ। "ষোল কলায় পূর্ণ চন্দ্র"—এই 'কলা' শব্দের অর্থ ভিন্ন। অমাবস্যা হইতে পূর্ণিমা ষোল তিথি। অমাবস্যার দিন চন্দ্র অদৃশ্য থাকে। পরে এক এক দিবস (বা তিথিতে) এক এক 'কলা'—ভাগ (part) বৃদ্ধি পাইয়া ষোল দিনে ষোল কলা পূর্ণ হয়।

৬ পৃঃ। আলোক-বর্ষ—light-year।

৭ পৃঃ। লুব্ধক—অপর নাম ব্যাধ, Sirius. ধ্রুবতারা the pole-star। কিন্নরী Alpha Centauri, দক্ষিণ আকাশে। অতিশয় উজ্জ্বল। লুব্ধক চিনিলে তাহার বহু দক্ষিণে অগস্ত্য তারা Canopus চিনিতে বিলম্ব হয় না। অগস্ত্য অতি উজ্জ্বল। ফাল্গুন মাসে রাত্রি ৭টা ৮টার সময় দক্ষিণ আকাশে অগস্ত্য দেখিতে পাওয়া যায়। সে মাসে ভোর ৪টা ৫টার সময় আরও দক্ষিণে দিক্‌চক্রের (horizon) অতি নিকটে কিন্নরীর দুই চক্ষু স্বরূপ দুইটী তারা জ্বল্‌-জ্বল্ করিতে দেখা যাইবে।

১০ পৃঃ। নিষ্প্রভতারা dark stars। এ সব তারা দেখিতে পাওয়া যায় না। কদাচিৎ দীপ্ত হইয়া উঠিলে দেখিতে পাওয়া যায়। দুই বৎসর হইল জ্যৈষ্ঠ-মাসে এইরূপ একটা 'নব তারা' (nova) দেখা গিয়াছিল।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া আণুবীক্ষণিক বস্তুর বিস্তার মাপিতে পারা যায়। কায়াণু blood corpuscles। রক্ত কায়াণু red blood corpuscles। রক্তে রক্ত কায়াণু ব্যতীত শ্বেত কায়াণু আছে, কিন্তু অল্প।

১১ পৃঃ। কল cell। বাঙ্গালায় প্রায়ই 'কোষ' বলা হইয়া থাকে। কিন্তু 'কোষ' নাম নির্দ্দোষ নহে। এ কারণ নূতন পরিভাষা করা গেল। ইংরেজী পারিভাষিক cell শব্দের অর্থ সংস্কৃত 'কল' ধাতুতে আছে। A cell 'কল', a tissue 'কলা'।

মি বাস্তবিক গ্রীক মি-উ অক্ষরের সংক্ষেপ। ইংরাজীতে মি-উ বলে।

অণুজীব microbes। কেহ কেহ 'জীবাণু' বলেন। কিন্তু 'জীবাণু' নাম দোষাবহ। অবশ্য জলমাত্রেই অণুজীব থাকে না। নির্ম্মল পবিত্র জলও আছে।

গণ-বিভাগ ও জাতি-বিভাগ। জাতি species, গণ genus। 'জাতি' ও 'গণ' পারিভাষিক। কিন্তু সংক্ষেপে লক্ষণ দেওয়া কঠিন। এক আদি হইতে জন্ম বা জাত বলিয়া জাতি। বহু জাতি মিলিয়া গণ। জাতির নীচে জাত variety, গণের উপরে বর্গ order।

১২ পৃঃ। বড় অণুবীক্ষণ, যাহাতে দৃষ্ট বস্তু অত্যন্ত বৃহৎ দেখায়। এই রূপ 'বড় দূরবীক্ষণ'।

১৩ পৃঃ। অণুজীবের লোম cilia। অণু molecule, পরম+অণু=পরমাণু atom। অণুর অবয়ব (parts) পরমাণু। তাড়িতাণু আধুনিক কল্পিত electron, আকাশাণু molecules or corpuscles of ether। সংস্কৃত দর্শনের 'আকাশ' এবং ইংরেজী বিজ্ঞানের ether ঠিক এক নয়। সাদৃশ্য কিছু আছে বলিয়া ether অর্থে 'আকাশ' বলা যাইতে পারে। আকাশ-পথে আলোক চলে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ (gravity) আকাশ-সম্ভূত বলিয়া কল্পনা চলিতেছে। তড়িৎ electricity; এই শক্তিও আকাশ-সম্ভূত।

শাস্ত্র—a department of knowledge, science।

ভব—এখানে শিব ঠাকুর নহেন। ভব existence, the world। ভবানী অবশ্য রূপকে। তিনি যেন হাঁড়ী-কুঁড়ী সাজাইয়া বসিয়াছেন।

১৪ পৃঃ। অণিমা—অণুত্ব minuteness। মহিমা, মহত্ব greatness; জড় matter, শক্তি energy। চিৎ এখানে কেবল বুদ্ধি নহে। এখানে অর্থ spirit। চিৎ জড়ীয় নহে, সুতরাং পরিমেয়ও নহে।

কলাগাছ

১৫ পৃঃ। সুঠাম—সং 'ধাম' হইতে বাং 'ঠাম'। ধাম শব্দের এক অর্থ দেহ। সুঠাম সুদেহ, সুঠাম দেহের সৌন্দর্য্যের এক কারণ অঙ্গের আনুরূপ্য (symmetry)।

বলন—দেহের বল-সূচক পেশীর পুষ্টতা। পেশী muscles।

১৬ পৃঃ। পাঙ্খড়ী—পক্ষ+ড়ী, পক্ষের তুল্য বলিয়া (perianth)। গর্ভ-কেশর—style, গর্ভাশয়—ovary, পরাগ—pollen, পরাগ-কেশর—filament। কেশের তুল্য বলিয়া কেশর।

১৭ পৃঃ। বর্ষায়ু—annual, যাহার আয়ুষ্কাল এক বর্ষমাত্র।

১৮ পৃঃ। শাক—herb। 'শাক' সংস্কৃত, ইহা বাঙ্গালা 'শাগ' নহে।

কুঠরী—cell, chamber। লতাপাতা-পচা—humus।

কষারসের কারণ কষায়ীন tannin। কষায়ীন ও লোহার যোগে কালী হয়।

১৯ পৃঃ। পাতার মাঝের মোটা শিরা মধ্যশিরা midrib। গাছের নাসা stomata।

২০ পৃঃ। প্রত্যেক নাসার দুই পাশে দুই অর্দ্ধ চন্দ্রাকার 'কল' থাকে। এই দুই 'কল' নাসার কপাট স্বরূপ।

২১ পৃঃ। কলা-বাসনা অর্দ্ধ গোলাকার। এই আকার হেতু উহার দৃঢ়তা বৃদ্ধি হইয়াছে। সমান ভারী বাখারী ও গোটা বাঁশের দৃঢ়তা সহজে বুঝিতে পারা যায়। বাইসিকেলের চাকার নেমি কলা-বাসনার তুল্য খোল। এই হেতু মানুষের দেহের ভার সহিতে পারে।

২৫ পৃঃ। কলাবউ—কলা arts। ইহার দ্যোতক (symbol) কলা-বধূ।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

২৬ পৃঃ। কবির নাম মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, উপাধি কবিকঙ্কণ। তাঁহার গ্রন্থের নাম 'অভয়ামঙ্গল', অভয়ার আশীর্ব্বাদ। সেকালে 'মঙ্গল' নামে বহু গ্রন্থ রচিত

হইয়াছিল। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' এইরূপ। মুকুন্দরামের গ্রন্থ 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' নামে খ্যাত। ইহা গাহিবার গান। সংস্কৃত মার্কণ্ডেয় চণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণের এক অংশ। চণ্ডী নামে অভয়ার ক্রুদ্ধভাব প্রকাশিত হয়। চামুণ্ডার রূপ আরও ভয়ঙ্কর। পুরাণে সৃষ্টি হইতে আখ্যান আরম্ভ হইয়া থাকে। বিধাতা স্রষ্টা। দক্ষের কন্যার নাম সতী। গিরিরাজ—হিমালয়-পর্ব্বতের রাজা। পর্ব্বতের অর্থাৎ হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশের।

২৭ পৃঃ। গণাই—গণপতি নামের সংক্ষেপে, আদরে।

সম্ভাবনা—সংস্কৃত অর্থে competency। কড়া—কড়ী। প্রেত-ভূত-পিশাচ—এই তিন শ্রেণী। লেখা—সংখ্যা।

রান্ধ্যে বাড়্যে—রান্ধিয়া বাড়িয়া। প্রাচীন রূপ। এখন সংক্ষেপে রেঁধে বেড়ে। প্রথমে অন্নরন্ধন, পরে পরিবেষণ। পরিবেষণে অন্নক্ষয় না হইয়া বৃদ্ধি হয়। অন্নক্ষয় অমঙ্গল। বস্তুতঃ অন্ন ভোজন দ্বারা অন্ন উপার্জ্জনের শক্তি বাড়ে।

গোঁয়াও—গমিত, অতিবাহিত করাও।

দুয়ারে কাঁটা দেওয়া—প্রবেশ নিষেধ করা। হরের নিবাস কৈলাস পর্ব্বতে ছিল। হিমালয়ের পশ্চিম ভাগে।

২৮ পৃঃ। গোঁসাই—'গোস্বামী' হইতে। মান্য পণ্ডিত ব্যক্তির নাম না করিয়া গোঁসাই বলা হইত। এখনকার Dr. (Ph. D.)।

প্রথম পাত্রে—পাত্রে প্রথম দিবার (অন্ন)।

উধার—উদ্ধার' হইতে, ধার।

পালি—পরিমাণ পাত্র বিশেষ।

সই সাঙ্গাতি—সখী ও সঙ্গতি (friend and companion)।

পোয়ের ময়ুর—পুত্র কার্ত্তিকের বাহন ময়ূর।

ঝুলি—ভিক্ষার ঝুলী।

বিশ্বকর্ম্মা—architect of the gods।

'কলিঙ্গ দেশ' রাঢ়ের দক্ষিণ ও পশ্চিম। এ দেশ হইতে কৈলাসে যাইতে বিন্ধ্য-গিরি পথে পড়ে।

২৯ পৃঃ। আরতি সং আরাত্রিক। রাত্রে দেবতার সম্মুখে দীপ প্রদর্শন। ইহা হইতে, প্রাচীন বাঙ্গালায় নিয়োগ (commission)। ইহার চিহ্ন-স্বরূপ

নিযুক্তের হাতে পান দেওয়া হইত। গুজরাট নগর অবশ্য প্রসিদ্ধ গুজরাথ অঞ্চল নহে।

৩০ পৃঃ। ভুঞা ভূমি+ইয়া ভূমিয়া—ভূইঁয়া—ভূঞা। 'ঞ' অক্ষরের উচ্চারণ ইঁঅ। সুতরাং ঞা=ইঁআ বা ইঁয়া। ভূঞা ভূস্বামী। পূর্ব্বকালে ভূঞা—সামন্তরাজের তুল্য ছিলেন। ইদানীর বড় জমিদার। কিন্তু ভূঞা রাজার সৈন্য থাকিত। তিনি নিজের দেশ নিজে শাসন করিতেন। অর্থাৎ তিনি feudatory chief ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমে ভূঞাদিগের দেশ ছিল। বীরভূমি, মাল-(মান্‌ভূমি), বরাহভূমি, শিখরভূমি প্রভৃতি দেশ নামে ভূঞা রাজাদিগের স্মৃতি জড়িত আছে।

বিমান—আকাশ-গামী যান।

পুষ্পক—পুষ্প-সাদৃশ্যে নির্ম্মিত। ইদানীর aeroplane বিমান বিশেষ।

সেকালে বণিকেরা রাজানুগ্রহ ভোগ করিত, রাজার আদেশে প্রজার জন্য দেশে অলভ্য দ্রব্য বিদেশ হইতে আনিত। উজানী নগরের রাজার আদেশে সাধু (বণিক) ধনপতি সিংহলে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিল। ধনপতির দুই পত্নী। লহনা প্রথমা, খুল্লনা দ্বিতীয়া। খুল্লনা চণ্ডীর দাসী, চণ্ডী-পূজা করিত; কিন্তু স্বামী ধনপতি শিবের পূজা করিত। ইহাতে মনে হয়, মুকুন্দরাম যে কালের বর্ণনা করিয়াছেন, সেকালে শিব-পূজার অবসান হইয়া শক্তিপূজা আরম্ভ হইতেছিল। অন্যান্য মঙ্গল কাব্য হইতেও এই অনুমান আসে। বোধ হয় বঙ্গদেশে শিবপূজা তত প্রচলিত ছিল না। বঙ্গদেশ বহুকাল শৈব ছিল বলিয়া জানা যায় নাই। কিন্তু ক্রমে শিব ও শক্তি মিলিত হইয়া শৈব-তন্ত্র ও শাক্ত-তন্ত্রের উৎপত্তি করিয়াছিলেন। 'তন্ত্র' শব্দের অর্থ a system। সাধারণতঃ তান্ত্রিক বলিলে শক্তির উপাসক বুঝায়। মুকুন্দরামের সময়ে শক্তি-তন্ত্র বহু প্রচলিত ছিল। শক্তি universal energy। শক্তির উপাসনা দ্বারা যিনি মঙ্গলকর, যিনি শিব, যিনি শঙ্কর, তাঁহার সমীপে যাইতে পারা যায়।

মগরার মোহানা—দক্ষিণ-বঙ্গে, কলিকাতা হইতে ২০।২৫ মাইল দক্ষিণে। সেখানে ভাগীরথী পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগরে পড়িত।

মোহানা—স্রোতের মুখ। মগরা সে স্থানের নাম। এখন সে মোহানা বুজিয়া গিয়াছে। গঙ্গাসাগর-সঙ্গম ডায়মণ্ড হারবার নামক স্থানের দক্ষিণে হইয়াছে।

৩১ পৃঃ। ধনপতি সাধু মগরার মোহানা হইতে সমুদ্র পথে তীর ভূমির নিকট দিয়া সিংহলে গিয়াছিলেন। যাইতে যাইতে প্রথমে পুরীর জগন্নাথ দর্শন করিয়াছিলেন। দর্শনের বর্ণনা কাল্পনিক নহে। ইহাতে বোধ হয় কবি স্বয়ং শ্রীক্ষেত্র দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি নানা দহের বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু গ্রাম্য কল্পনা বলে। জলাশয়ে অতি নিম্ন স্থানের নাম দহ। স্রোতোবশে নদীতে দহ পড়ে। সমুদ্রেও আছে। কালীদহ—যে দহের জল কালী বর্ণ। সিংহলের নিকটবর্ত্তী কোন দহ হইবে।

কামিনী কমলে অবতার—পদ্মের উপরে এক কামিনীর আবির্ভাব। তাঁহার ক্রোড়ে গজানন, কিন্তু দূর হইতে ধনপতি দেখিল এক গজ।

সংহার—বিনাশ (destruction) নহে; সং সম্+হৃ ধাতু সম্যক্ আহরণ, drawing or bringing together। বিশ্বের সংহার বলিলেও এই অর্থ। যাহা বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন ছিল, তাহা সংক্ষিপ্ত ও একবিধ হয়। করিবর কামিনীর মুখ হইতে উদ্গীর্ণ হইতেছে, মুখে আহৃতও হইতেছে। গজানন মাতৃস্তন্য পান করিতেছেন, আবার পলায়নের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার করিমুখের শুণ্ড ধনপতির ভ্রমের কারণ। তা ছাড়া, ইহাও ত অপূর্ব্ব; যে দহে যোজন প্রমাণ জল, যাহাতে সত্য সত্য এক যোজন গভীর জল, তাহাতে নলিনী জন্মে কি রূপে? আরও আশ্চর্য্য, সে নলিনী মানুষের ভর সহে কি রূপে? পরমাশ্চর্য্য এক হস্তীকে এক কামিনী নলিনীর উপরে বসিয়া হেলায় ধরিতেছে হেলায় ছাড়িতেছে। কবিকঙ্কণের কমলে-কামিনী অদ্ভুত-রসের পরাকাষ্ঠা। স্থান অসম্ভাবিত, পাত্র অসম্ভাবিত, ব্যাপার অসম্ভাবিত। এক দিকে ত্রাস জন্মিতেছে, অন্য দিকে মসীবর্ণ জলে প্রস্ফুটিত কমলদলের সৌন্দর্য্য, তদুপরি কামিনীর মুখচ্ছবি, সবই বিস্ময়-রসকে ঘনীভূত করিয়া দিয়াছে।

৩৩ পৃঃ। স্বর্ণগোধিকা রূপিণী অভয়া—ব্যাধ কালকেতুকে ছলনা করিবার নিমিত্তে অভয়া সোনারঙ্গের গোসাপ হইয়া কালকেতুর হাতে ধরা পড়িলেন। সে জানে গোসাপ; দোড়ী দিয়া বাঁধিয়া নিজের কুটীর দ্বারে রাখিয়াছে। তাহার স্ত্রী দ্বারে আসিয়া এক পরম-সুন্দরী রামা দেখিতে পাইল, বিস্ময়ে অভিভূত হইল। কালকেতুও আকাশপাতাল ভাবিতে লাগিল। কোথায় গোসাপ, কোথায় অকলঙ্ক শশিমুখী! তাও অস্পৃশ্য অন্ত্যজ ব্যাধের বাড়ীতে! এখানেও কবিকঙ্কণের অদ্ভুতরসের চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যায়।

৩৫ পৃঃ। বর্দ্ধমান জেলায় জগাই সেকরা প্রসিদ্ধ গায়ক ছিল। তাহার দুই যমজ পুত্র লইয়া চণ্ডীর গান গাহিত। গোবিন্দ, এক বিখ্যাত কৃষ্ণযাত্রার অধিকারী ছিলেন।

শিয়াল প্রহরী—রাত্রে প্রহরে প্রহরে শিয়াল ডাকে, এই বিশ্বাস গ্রাম্য জনের আছে।

কোন্ ঘাটে খাবে পানি—যখন দারুণ পিপাসায় কলসীর জলে না কুলায়, তখন নদী বা পুষ্করিণীর ঘাটে গিয়া জল পান করিতে হয়। পিপাসার নানা কারণ আছে। শোকে ও ত্রাসে জলতৃষ্ণা বাড়ে।

পিপীড়ার পাখা—উই পোকার পাখার তুল্য ক্ষণস্থায়ী।

মাণিক্য—এক এক মাণিক এমন আছে যে মূল্যে সাত রাজার ধনের সমান।

তিন সন বই দিও কর—তিন বৎসর ব্যতীতে পরে জমির খাজনা দিও। এই অনুগ্রহ অল্প নয়।

দুই চক্ষু জিনি নাটা—নাটা (সং নক্ত) নামে এক কাঁটা গাছ আছে। তাহার বীজ গোল, বড় বড়। গিলা বীজ, যাহা দিয়া কাপড় কুঞ্চিত করা হইয়া থাকে, তাহার তুল্য।

৩৬ পৃঃ। অলকা তিলকা—সং অলক কুঞ্চিত কেশ; বিশেষতঃ কপালের উপরের, ইহার সাদৃশ্যে ললাটে ও কর্ণমূলে চন্দনের চিত্র রচিত হইত। এই চিত্রের নাম অলকা। 'তিলকা' সং তিলক হইতে। মৃগনাভি-মিশ্রিত চন্দনের তিলক প্রসিদ্ধ ছিল। কুঙ্কুম ও অন্য নানাবিধ সুগন্ধ রঙ্গ, চূয়া ও চন্দন, প্রভৃতি দিয়া অলকা-তিলকা রচিত হইত। এই রচনা যেমন-তেমন কর্ম্ম নয়, একটা কলা (art)।

অরুন্ধতী—পুরাণে বশিষ্ঠ ঋষির পত্নী। উভয়েই আকাশে তারার আকারে বিদ্যমান। সপ্তর্ষি নক্ষত্রের এক তারার নাম বশিষ্ঠ; এই তারার সন্নিকটে একটি ছোট তারা আছে, তাহার নাম অরুন্ধতী। জ্যৈষ্ঠ মাসে রাত্রি ৭টা ৮টার সময়ে সপ্তর্ষি মাথার উত্তরে দেখিতে পাওয়া যায়, মাথার দিক হইতে গণিলে দ্বিতীয় তারা বশিষ্ঠ।

৩৭ পৃঃ। কাঙর কামিক্ষা—'ঙ' অক্ষরের উচ্চারণ উঁঅ। অতএব কাঙর—উচ্চারণে কা-উঁ-র। 'কামরূপ' নামের অপভ্রংশে। কামরূপের কামিক্ষা দেবী শক্তিতান্ত্রিকের প্রধান উপাস্যা।

তন্ত্র-মন্ত্র—তন্ত্র ও মন্ত্র।

৩৮ পৃঃ। বুলন কাণ্ডার—এক জনের নাম। কর্ণধার শব্দ হইতে 'কাণ্ডার'। শব্দটি কা-ণ্ডা-র, কি ভা-ণ্ডা-র (ভা-ণ্ডা-রী), তাহাতে সন্দেহ আছে। ভাণ্ডারী নাপিত। আজিকালি নাপিত পান-গুআ দিয়া নিমন্ত্রণ করে।

৩৯ পৃঃ। পরীক্ষা লইবে—যাহা দ্বারা পরীক্ষা করিতে পারা যায়—এই অর্থে পরীক্ষা।

আগুণ ভারা—'বারণ' হইতে ভারা। মন্ত্রদ্বারা অগ্নির দাহিকা বারিত প্রতিহত হইতে পারে।

জৌ-গৃহ—জতু লাক্ষার ঘর।

পাছড়া—সং প্রচ্ছদ হইতে। আজিকালি বলি চাদর। মোটা সূতায় পাছড়া হইত। এই শব্দের কিঞ্চিৎ রূপান্তরে পা-ছু-ড়ী।

পাট—পট্ট, রেশম।

পল—প্রায় ৪ ভরি ওজন।

৪০ পৃঃ। বিশাই—বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্ব+আই (আদরে)। ইহাঁর পুত্র হনূমান, কবিকঙ্কণের ও গ্রাম্যজনের কল্পনা।

৪১ পৃঃ। রাশিচক্র—মেষবৃষাদি দ্বাদশ রাশি আকাশের এক চক্রে (circle) আছে।

শতানন্দের ভাস্বতী—শতানন্দ নামক জ্যোতিষীর লিখিত ভাস্বতী নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ। শ্রীনিবাস কৃত দীপিকা-গ্রন্থে শুভাশুভ মুহূর্ত্ত বিচার আছে। অধুনা দীপিকার স্থানে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের স্মৃতিগ্রন্থ চলিতেছে। ইনি চৈতন্য প্রভুর সমসাময়িক ছিলেন। সে আজি চারিশত বৎসর পূর্ব্বের কথা।

ধুতি—ধৌ-তি হইতে ধুতি। অদ্যাপি বঙ্গ ব্যতীত অন্যত্র ধুতি কেবল পুরুষ-পরিধেয় হয় নাই।

মেঘডম্বর—মেঘ-ডম্বর সদৃশ বর্ণ। গৌরী-নারীর দেহে নীলবর্ণ বসন রমণীয় সন্দেহ নাই। ডম্বর—সং, অর্থ সদৃশ।

৪২ পৃঃ। পূরী—নগর।

সাতানই বন্দে—৯৭ বন্দে।

বন্দ—বন্ধ a plan, a scale।

পাঁচিল—শব্দটি পাঁ-চী-র, প্রা-চী-র হইতে। নদীয়া ও কলিকাতায় বলে পাঁ-চি-ল।

নাছ-বাট—নাছ, লাছ, বড় পথ, রাজপথ (সং রথ্যা)। বাট—বর্ত্ম, পথ।

আওয়াস—সং আ-বা-স ; রাজবাড়ীকেই আওয়াস বলা হইত।

দুর্গা-মেলা—অধুনা চণ্ডীমণ্ডপ। মেলা—সম্মুখ খোলা লম্বা ঘর।

নগর-চাত্তর—নগর-চত্বর, যেখানে নগরের সকল পথ মিলিয়াছে।

৪৩পৃঃ। চেড়ী—দাসী।

কাহন—এক টাকা ধরা যাইতে পারে। অতএব এক পণ এক আনা, দশ বুড়ী দুই পয়সা।

৪৪ পৃঃ। কোটাল—কোট্টপাল, আজিকালির পুলিশ-দারোগা।

দিগারী—দিক+আর=দিগার; ইহার কর্ম্ম দিগারি। দিক্ দেশ ; পাল হইতে আর। অতএব মূলার্থ দিক্পাল। এখন চৌকিদার।

কানে সোনার কুণ্ডল—রাজার অনুগ্রহের চিহ্ন।

পাটায় নিশানি—পাট্টায় প্রজার ভূমিস্বত্ব নিরূপিত থাকে।

নিশানি—মোহর (seal) ;

ডিহিদার—রাজস্ব আদায়কারী নায়েব।

ডিহি—রাজস্ব আদায়ের প্রধান স্থান।

সেলামি বাঁশগাড়ি ইত্যাদি নামে অতিরিক্ত কর আদায় করা হইত।

বাব—বাবৎ, heading। এই সব বাব ছল, ব্যাজ, pretext। যথা, পার্ব্বনি দেও, পঞ্চক (committee)র খরচ দেও, পুত্রের জন্মে দেও, গুয়াপান খাইতে দেও, নুন খরচ, সোনার গহনা, রাজপুত্রের অন্নপ্রাশন, ইত্যাদি। এই সব বাজে (বাহ্য) আদায়ে প্রজা পীড়িত হইত। কবি নিজে ভুগিয়াছিলেন। এই হেতু, বলিতেছেন নূতন স্থাপিত গুজরাট নগরে এ সব অত্যাচার হইবে না।

গোহারি—কাতরোক্তি, রাজদ্বারে অভয় প্রার্থনা।

৪৬ পৃঃ। থানা—স্থান হইতে, কিন্তু অর্থ পুলিশ ষ্টেসন।

সম্বল—পাথেয়, পথের ভোজ্য।

অভয়া-মঙ্গল—কবি অভয় পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মনে অভয়া নাম উঠিয়া থাকিবে।

আড়া—সং আঢ়ক। ধানকলাই প্রভৃতির মাপ বিশেষ, প্রায় চারি মণ।

তেলুগু দেশ

৪৭ পৃঃ। তেলুগু—অপভ্রংশে তেলেঙ্গা, সং ত্রিকলিঙ্গ নাম হইতে। অর্থাৎ কলিঙ্গ দেশের তৃতীয় ভাগ।

ওড়িয়া—সং ওড্র হইতে ওড় ; ওড়+ইয়া=ওড়িয়া। সং ওড্র-বিষয় অপভ্রংশে ওড়িষ্যা। বিষয়— দেশ, territory।

৪৮ পৃঃ। রম্ভা—চিল্‌কা হ্রদের পার্শ্বস্থিত স্থান বিশেষ।

উৎকল—উৎকলিঙ্গ হইতে।

চিলিকা—৺রাধানাথ রায় ওড়িয়া ভাষায় 'চিলিকা' নামক কবিতা লিখিয়াছিলেন।

নীস—gneiss নামক প্রস্তর বিশেষ।

৫১ পৃঃ। ত্রিপুণ্ড্র—পুণ্ড্র ইক্ষুর এক জাত। এখন বলে পুঁড়ী আখ। চন্দনাদির তৎতুল্য দীর্ঘ রেখা। তিনটি রেখাতে ত্রিপুণ্ড্র।

৫২ পৃঃ। গিরিদুর্গ—দুর্গম বলিয়া দুর্গ। চারি পাঁচ প্রকার দুর্গ ছিল। গিরি বেষ্টিত হইলে গিরিদুর্গ। সমস্থলে (plains) প্রাকার ও পরিখা দ্বারা দুর্গ করা হইত। ইহার নাম স্থলদুর্গ। বঙ্গদেশের প্রাচীন দুর্গ এইরূপ।

৬০ পৃঃ। দক্ষিণের গঙ্গবংশের এক নৃপতি রাজেন্দ্র চোড় বঙ্গবিজয় করিয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্র অনঙ্গভীম খ্রীঃ ১২শ শতাব্দে পুরীর বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

ফুলের বাগান

৬১ পৃঃ। কবি—ইংরেজী কবি সেক্‌সপীয়র লিখিয়াছেন।

কণ্ব মুনি ইত্যাদি—কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে। সহকার—আমগাছ, যে আম গাছের ফুল অতিসৌরভ। শোকাশ্রুতে চাঁপাফুল—কাশীদাসের মহাভারতে (আদিপর্ব্বে), কেতকা নামে এক যুবতী "গঙ্গাতীরে বসি কান্দে পড়ে অশ্রুজল। তাহে জন্ম হয় দিব্য কনক কমল।" প্রবন্ধে চাঁপাফুল না হইয়া কমল হইবার ছিল।

৬৪ পৃঃ। চক্ষুর কোমল নাড়ী—বাতনাড়ী, nerves। অনেকে বলেন 'স্নায়ু'। কিন্তু তাহা ভুল। স্নায়ু nerve নহে, a tendon, sinew। 'জাতী' চামেলীর সংস্কৃত নাম। বাঙ্গালাতে জাই বলে। চামেলী হিন্দী নাম।

৬৫ পৃঃ। ভাওলেট violet। মেডেন হেয়ার maiden-hair এক প্রকার fern। ফার্ণ আওতার গাছ। ইহার ফুল হয় না। অর্কিড orchid। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা নাম রাস্না। ইহা এদেশীয় গাছ, প্রায়ই বৃক্ষের শাখায় জন্মে। মিনিয়োনেট mignonette। ক্রোটন croton। ইহার পাতায় শোভা বলিয়া পাতা-বাহার নামে খ্যাত হইতেছে।

৬৬ পৃঃ। রাধিকাচূড়া—এদেশীয় নহে। কৃষ্ণচূড়ার সাদৃশ্যে রাধিকাচূড়া নাম পাইয়াছে। মার্সেলনীল—Marchel Neil নামক গোলাপ। বিগ্‌নোনিয়া bignonia : আন্টিগোনন antigonon বিদেশী লতা।

৬৭ পৃঃ। অরবিন্দ—পদ্ম। নীলোৎপল,—নীলশুঙ্কি। অশোকের নূতন পাতা তাম্রবর্ণ, পুষ্প দাড়িম্বপুষ্পবর্ণ। গাছের প্রায় গোড়া হইতে নূতন পাতা ও ফুল ধরে। মোতিয়া বেলা—বড় মুক্তাকার বেলা ফুল। মুক্তার আকার বলিয়া মোতিয়া।

৬৮ পৃঃ। তরু tree। ইহার গুঁড়ি হয়। ক্ষুপ shrub ঝোপের মতন ইহার গুঁড়ি হয় না। দ্রোণ চলিত ভাষায় ঘল্‌ঘষিয়া বলে। শাক herb। ইহার কাঠ হয় না। শাক শব্দ সংস্কৃত। শাক ও বাঙ্গালা শাগ এক বস্তু নহে। শাগ মাত্রেই শাক, কিন্তু শাক মাত্রেই শাগ নহে। মালতী নাম বাঙ্গালা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সংস্কৃত মালতী, জাতীর নামান্তর। যাসমিন jasmine। জাতী যূথী মল্লিকা কুন্দ এসব পরস্পর সদৃশ। ইংরেজীতে jasmine বলিতে হয়।

৬৯ পৃঃ। কূটজ, কুড়চী চলিত নাম। ইহা আরণ্য ক্ষুপ। ইহার ছাল ও বীজে ঔষধ হয়। অতসীর চলিত নাম তিসী। ইহার বীজ মসিনা। মসিনার তেল হয়। কালমেঘ জলের ধারে জন্মে। ফুল মেঘতুল্য নীল। লাঙ্গলিকা চলিত নাম-বিষলাঙ্গল্যে। বর্ষাকালে জন্মে। ফুল অগ্নিবর্ণ। ললিতকলা—কান্তকলা, fine arts।

কুষ্মাণ্ড

৭৫ পৃঃ। প্রতান—শুঁড়, tendril।

৭৬ পৃঃ। গরজ—প্রয়োজন, necessity। বালাই বিপদ। গরজ, বালাই, শব্দ দুইটি ফার্সী।

৭৭ পৃঃ। ওরফে—অন্য নামে (alias) (ফার্সী)।

৭৮ পৃঃ। লাউ কুমড়া প্রভৃতি গাছগুলি এক বংশের বা এক বর্গের। রেচক—ভেদক, purgative। (রেচন ও ভেদন ক্রিয়া এক নহে, ফলে প্রায় এক)।

৮১ পৃঃ। কর্ষণী—শুঁড়, tendril। কর্ষণীর স্পর্শবোধ আছে, একথা বলা কঠিন। বোধ বা জ্ঞান, চৈতন্যের কাজ।

৮৩ পৃঃ। তিক্তরস দ্বারা আত্মরক্ষা—লাউ, কুমড়া প্রভৃতি কৃষিগুণে রূপান্তরিত হইয়াছে, তিক্তরস অদৃশ্য হইয়াছে। বুনো লাউ এত তিতা যে মুখে দিতে পারা যায় না। মাকাল,—মহাকাল। বন্য গাছ, তিক্ত ও বিরেচক।

ধূলা

৮৬ পৃঃ। ঘর-দুয়ার, কাপড়-চোপড়, ইত্যাদি শব্দ-যুগ্ম দ্বারা বহুত্ব প্রকাশিত হয়। আমার লিখিত 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' দেখ। জৈব—জীবজাত। মানুষ পশু পক্ষ্যাদি প্রাণী, ও তরু লতাদি উদ্ভিদ্, এই দুই-ই জীব (organism)। জৈব—organic। যাহা জৈব নহে, তাহা অজৈব, inorganic। ছত্রাক—বেঙ্গের ছাতি mushroon। এই বর্গের গাছের বীজ না হইয়া রেণু (spores) হয়, রেণু হইতে গাছ হয়। বাক্‌টিরিয়া, bacteria ; বাসিলি bacilli ; অণুজীবের গণের (genus) মধ্যে দুই গণ। কালবৈশাখী—বৈশাখ মাসের অপরাহ্ণের প্রবল ঝড় nor'westers।

৮৭ পৃঃ। সাণ্ডাদ্বীপ,—বোর্ণিও সুমাত্রা যাবা প্রভৃতি দ্বীপ পুঞ্জ। সুমাত্রা ও যাবার মধ্যে সাণ্ডা (Sunda) প্রণালী। এখানে ক্রাকাতোয়া Krakatoa নামে দ্বীপ।

আবহ—atmosphere। মৃণ্ময় পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আবহ। আবহের ঊর্দ্ধ প্রদেশ অন্তরীক্ষ। ইহার ঊর্দ্ধে দিব্য প্রদেশ the heavens। দিব্য heavenly। উল্কা shooting stars।

৮৯ পৃঃ। রজঃ—আবহের যে সূক্ষ্ম ধূলি হেতু দৃষ্ট বস্তু অস্পষ্ট দেখায়, haze। সন্ধ্যা—প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা, দিবা ও রাত্রির সন্ধি। বন্ধূক, বন্ধুক—বাঁধলী ফুল, আল্‌তা বর্ণের। দিগ্‌দাহ—দিক্ চক্র horizon ; ইহাতে দাহ glowing redness of the sky।

৯০ পৃঃ। আবহের বিড়ম্বনা—deception caused by the atmospheric haze।

খণ্ডগিরি

৯১ পৃঃ। অর্হৎ—মূলার্থ মান্য। ইহা হইতে বৌদ্ধ ও জৈন-শ্রেষ্ঠ। নির্বাণ—নিবিয়া যাওয়া, বৌদ্ধমতে নিজের আত্মার বিলয়। যতি—যিনি রাগদ্বেষাদি জয় ও সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। ধ্যান—চিন্তা, ধারণা—গ্রহণ, সমাধি—চিত্তের যে অবস্থায় ধেয় বস্তু মাত্র প্রকাশ পায়। সমাধিই শেষ ফল।

খণ্ডগিরি—ভুবনেশ্বরের মন্দির হইতে চারি পাঁচ মাইল দূরে একটা বালিয়া পাথরের (sand-stone) ছোট পাহাড়। ইহার নিকটে আর একটা পাহাড় আছে, নাম উদয়গিরি।

৯২ পৃঃ। ভিক্ষু—বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। ইহাঁরা ভিক্ষা দ্বারা জীবন ধারণ করিতেন। গাথা—ধর্ম্ম-বিষয়ক শ্লোক, কিন্তু বেদের নয়। আর্য্য গাথা—অবশ্য কীর্ত্তি দেখিয়া মানস-কর্ণে গাথা শ্রবণ।

৯৪ পৃঃ। প্রত্নতত্ত্ব জিজ্ঞাসু—পুরাতন ইতিহাস জানিতে চান। ভূতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু—পৃথিবীর ইতিহাস জানিতে চান।

৯৭ পৃঃ। চৈত্য—আয়তন, sanctuary।

৯৮ পৃঃ। অশোক—প্রচীন কালের এক প্রসিদ্ধ সম্রাট। ইনি জীবে দয়া প্রচার করিতে পর্ব্বতগাত্রে অনুশাসন খোদিত করাইয়াছিলেন। সে আজি ২১৫০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। ইনি নিজেকে 'দেবগণের প্রিয়দর্শী' নামে আখ্যাত করিয়াছিলেন।

৯৯ পৃঃ। মঠ—ছাত্রশালা (residential college)।

দধিবীজ

১০০ পৃঃ। ভাব-প্রকাশ—ভাব-মিশ্র বিরচিত সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ। পলীন—নূতন রচিত শব্দ। পল মাংস; শুধু পলে যাহা আছে, এই অর্থে বাঙ্গালা ঈন প্রত্যয়। ইংরেজী protein। পললীন—নূতন রচিত শব্দ। পলল পঙ্ক পালো; শুধু পললে যাহা আছে, তাহা পললীন, carbohydrates। স্নেহ তৈল পদার্থ (oils)। পার্থিব—মাটিতে যাহা পাওয়া যায় (minerals)।

১০২ পৃঃ। কিণ্ব—ferment, প্রায়ই সুরা-কিণ্ব। ইহার যোগে তণ্ডুল ও শর্করা বিশ্লিষ্ট হইয়া সুরাতে পরিণত হয়। শুক্ত—সির্কা, vinegar।

১০৩ পৃঃ। সন্ধান fermentation। সুরা বীজ—ইংরেজীতে বলে yeast।

১০৪ পৃঃ। শর্করা—বিশ্লিষ্ট হইয়া সুরা বা কোহল alcohol, এবং অঙ্গারকাম্ল গেস carbonic acid gas উৎপন্ন হয়।

১০৫ পৃঃ। ৩৫°শ—শতাংশিক centigrade উষ্মমান (thermometer) যন্ত্রের ৩৫ অংশ degrees। উষ্মা—temperature।

১০৬ পৃঃ। দধিবীজ বিক্রয়—এই প্রবন্ধ ২৪।২৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন দধিবীজ সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা ছিল না। ইদানী দধিবীজ বিক্রয় হইতেছে।

১০৭ পৃঃ। নিরণুজীব—অণুজীব microbes হীন, sterilized।

পুষ্টিকর—nutritious।

বয়ঃস্থাপক—বয়ঃ youth স্থির রাখে, গত হইতে দেয় না।

পৃথু অন্ত্র—অন্ত্রের (intestines) দুই ভাগ। আমাশয় (stomach) পরেই অতিশয় দীর্ঘ কিন্তু সরু ভাগ। ইহা তনু অন্ত্র small intestines। ইহার পরে হ্রস্ব কিন্তু পুরু ভাগ। ইহা পৃথু অন্ত্র large intestine। ইহা মলাশয়।

১০৮ পৃঃ। স্নিগ্ধ—স্নেহ—তৈল-যুক্ত।

কৃশতানাশক—fattening। প্রাণকর—life-giving, life prolonging।

দধিভোজনের বিধি,—যে-সে দেহে যখন-তখন দধিভোজন কর্ত্তব্য নয়।

অগ্নি মন্থন

১১০ পৃঃ। মন্থন—যেমন ঘোল মন্থনে যষ্টি এক স্থানে থাকিয়া এ দিকে ও দিকে ঘুরিতে থাকে। এইরূপ গতি—মন্থন। মন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপাদন—অগ্নিমন্থন।

ভূগর্ভ নিহিত অগ্নি—প্রাচীন সংস্কৃত নাম রসাতলাগ্নি, আগ্নেয় গিরির অগ্নি।

অরণি—যে কাষ্ঠদ্বয় ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন করিতে পারা যায়। কঠিন প্রস্তর যেমন অগ্নিপ্রস্তর, চকমকির পাথর।

বজ্রাগ্নি—electricity বোতলে (storage cells) পুরিয়া রাখা হইতেছে।

১১১ পৃঃ। মৃত্তিকা—ভস্ম ash। এ কি পাথর—লোহার আকর (ore)। আদিম মানব শিলা ঘষিয়া ঘষিয়া অস্ত্র শস্ত্র করিত। লৌহ আবিষ্কারের পর মানবের ক্ষমতা শতগুণে বাড়িয়া উঠিয়াছে।

১১২ পৃঃ। গোলপিণ্ড—সূর্য্য।

সূর্য্যকান্ত—এমন আকারের (lens-shaped) স্বচ্ছ প্রস্তর (যেমন স্ফটিক প্রস্তর rock crystal) যাহা সূর্য্যাভিমুখে ধরিলে পশ্চাৎ পার্শ্বে অগ্নি বমিত (emitted) হইতে থাকে। ইদানী কাচের সূর্য্যকান্ত (burning glass) নির্ম্মিত হইতেছে।

বর্ষ—বর্ষণ বৃষ্টি হইতে ; এক বৃষ্টিকাল হইতে পর বৃষ্টি কাল।

অগ্নিহোত্রী—পবিত্র অগ্নি রক্ষা ও অগ্নিতে হোম করা ইহাঁদিগের কার্য্য ছিল।

কার্ম্মিক—workman।

অগ্নির উপাসক—পারসীক জাতি।

জড়বিজ্ঞান—material science।

১১৩ পৃঃ। বাত-বহা নাড়ী—nerves, সংক্ষেপে বাত-নাড়ী।

দুই বস্তুর নৈকট্যে—দুই বস্তুর স্পর্শে তড়িৎ বা তাড়িত (electricity)। যাহাকে স্পর্শ বলা যায়, তাহা নৈকট্য মাত্র।

বিড়ম্বিত—প্রতারিত, deceived। আমরা শব্দের অন্তরালে প্রকৃত অজ্ঞানতা প্রায়ই লুকাইয়া রাখি। একটা নাম দিয়া মনে করি বিষয়টা জানিয়াছি।

নিত্য সালোক্য—লোক world, এক লোকে সতত বাস।

১১৪ পৃঃ। শমী—এক প্রকার বৃক্ষ, বাঙ্গালা শাঁই গাছ।

তারক—তারক নামে এক অসুর।

সেনানী—সেনাপতি।

১১৫ পৃঃ। বাঁশে বালুকাকণা—এই বালুকা শুধু চোখে নহে অণুবীক্ষণে দৃশ্য হয়, এই বালুকা হেতু বাঁশের চেঁআড়ীর দ্বারা ছুরীর কাজ করিতে পারা যায়।

১১৬ পৃঃ। কাচ-করণ কলা—the art of making glass।

শুদ্ধিপত্র

পুস্তকে কয়েকটি ছাপার ভুল হইয়াছে। পাঠক সদয় হইয়া ভুলগুলি শোধন করিয়া লইবেন।

				অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	পৃষ্ঠ	১৫	পঙ্‌ক্তি	কোটী	কোটি
১৬	,,	২২	,,	পাগড়ী	পাখড়ী
৩২	,,	১৫	,,	সংসারে	সংসারের
৬৪	,,	১০	,,	নাভী	নাড়ী
৭৫	,,	১১	,,	কুড়ে	কুঁড়ে
,,	,,	১৪	,,	বিতান	প্রতান
৭৮	,,	১৩	,,	সাপেক্ষ্য	সাপেক্ষ
৭৯	,,	২০	,,	জ্ঞাতী	জ্ঞাতি
৮৩	,,	২২	,,	মাথাল	মাকাল
৮৫	,,	২০	,,	কাষ্ঠ	কাঠ
৮৬	,,	৮	,,	আজৈব	অজৈব
,,	,,	৯	,,	আজৈব	অজৈব
১১২	,,	১৪	,,	রহস্যপূর্ণ	রহস্তপূর্ণ